সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষা ঃ ঢাকা শহরের কতিপয় স্কুল ও কলেজের উপর একটি সমীক্ষা

বিশ্বম্ভর কুমার নাথ
রেজিঃ ৩৪৩/৯২-৯৩
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ রংগলাল সেন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
382833

382833

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সমাজবিজ্ঞানে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি রচিত ও উপস্থাপিত

M.Phil.

382833

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সারণীর তালিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ক) প্রস্তাবনা ১

খ) গুরুত্ব ৪

গ) পদ্ধতি ৫

ঘ) পরিধি ৭

ঙ) প্রকল্প ৮

382832

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত কাঠামো

২.১ শ্রেণীর ধারণা ৯

২.২ শিক্ষার ধারণা ২৫

২.৩ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা ৩০

২.৪ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব ৩৫

২.৫ সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৪৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করা আমার দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে আমি প্রথমে শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা ডঃ রাবেয়া খাতুন এর তত্ত্বাবধানে এম, ফিল কোর্সে ভর্তি হই। তিনি আমাকে আমার বর্তমান গবেষণার কাজে উৎসাহিত করেন। সেজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরবর্তীতে আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ রংগলাল সেন আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমার গবেষণা কর্মটি সমাজবিজ্ঞান সম্মত করার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তিনি যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমাকে গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন তা সত্যিই বিরল। আমি তাই তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিকট ও আমি নানাভাবে ঋণী। গবেষণার শুরু থেকেই তাঁদের দিক-নির্দেশনা ও সাহায্য- সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। আমার নির্বাচিত ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল/ কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রতিও আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তারা প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন। আমার কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুর সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আমি তাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বোপরি, আমাকে এম, ফিল করার সুযোগ দানের জন্য সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

382833

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিশ্বম্ভর কুমার নাথ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ

৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঃ বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ ৫২

৩.২ বিগত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষাখাতে অর্থায়ণের একটি তুলনামূলক সমীক্ষাঃ ১৯৪৭-১৯৯৭ ৭৫

৩.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের স্বরূপ ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকা শহরের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো

৪.১ ঢাকা শহরের ঐতিহাসিক পটভূমি ১১২

৪.২ ঢাকা শহরের অধিবাসী ও ভৌগোলিক পরিবেশ ১১৬

৪.৩ ঢাকা শহরের ভূ- সম্পত্তির মালিকানার ধরন ১১৭

৪.৪ ঢাকা শহরের শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকা শহরের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ও শিক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক রূপ

৫.১ শিক্ষা ও শ্রেণী ঃ সামাজিক কাঠামোগত পর্যালোচনা ১৩২

৫.২ ঢাকা শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান সমস্যাবলী ১৫০

৫.৩ শিক্ষা ও শ্রেণী ঃ জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ ১৬৪

উপসংহার ১৯৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৯৯

পরিশিষ্ট ২০৭

প্রশ্নমালা ২২৪

মানচিত্র ২২৫

আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর তালিকা

সারণী		পৃষ্ঠা
২.১	বাংলাদেশে পেশার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক	৪৬
৩.১	বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা পরিস্থিতি	৭৭
৩.২	শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের পরিবর্তন	৭৭
৩.৩	রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার পাশাপাশি অবস্থান	৮১
৩.৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার	৮২
৩.৫	বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বরাদ্দের হার	৮৯
৪.১	Decennial Population of Dhaka City	১১৫
৪.২	ঢাকা শহরের ভূমি মালিকানার ধরন	১১৮
৪.৩	ঢাকা শহরে ব্যক্তিগত ভূমি ব্যবহারের ধরন	১১৯
৪.৪	এলাকা ভিত্তিক ঢাকা শহরের ব্যক্তিগত জমির ব্যবহারের ধরন	১২০
৪.৫	ঢাকা শহরের বসবাসরত পরিবার পরিজন এবং পরিবারের আকৃতি	১২৫
৪.৬	ঢাকা শহরে শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক	১২৬
৪.৭	ঢাকা শহরে লিঙ্গ ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক	১২৭
৫.১	জাপানের শিক্ষার উন্নয়নের গতিধারা	১৩৮
৫.২	পাকিস্তানে কলেজ শিক্ষার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়	১৬১
৫.৩	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৬৪
৫.৪	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পেশা	১৬৫
৫.৫	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মাসিক আয়	১৬৬
৫.৬	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আবাসিক মর্যাদা	১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পেশার আয়তন	১৬৮
৫.৮	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উত্তরদাতাদের অভিভাবকদের পরিবারের সদস্যদের বয়সসীমা এবং নির্ভরশীলতার ধরন	১৬৯
৫.৯	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অভিভাবকদের মাসিক ঋনের পরিমাণ	১৭০
৫.১০	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ	১৭১
৫.১১	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় সাহয্যকারী	১৭২
৫.১২	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষকের সংখ্যা	১৭৩
৫.১৩	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনার শতকরা হার	১৭৪
৫.১৪	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষকের জন্য মাসিক ব্যয়কৃত টাকার পরিমান	১৭৫
৫.১৫	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার ধরন	১৭৬
৫.১৬	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা	১৭৭
৫.১৭	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার	১৭৮
৫.১৮	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সফর ব্যবস্থা	১৭৯
৫.১৯	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের অর্থ সরবরাহ	১৮০
৫.২০	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাইস্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থার তারতম্য	১৮১
৫.২১	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থার তারতম্য	১৮২
৫.২২	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তারতম্য	১৮৩
৫.২৩	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের হাইস্কুল পর্যায়ে অধ্যয়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন	১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৪	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ইন্টারমেডিয়েট কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন	১৮৫
৫.২৫	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ডিগ্রী পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন	১৮৬
৫.২৬	শিক্ষার সাথে পেশার সম্পর্ক	১৮৭
৫.২৭	শিক্ষার সাথে আয়ের সম্পর্ক	১৮৮
৫.২৮	পেশার সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক	১৮৯
৫.২৯	পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক	১৯০
৫.৩০	শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের সাথে আয়ের সম্পর্ক	১৯১
৫.৩১	শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক	১৯২
৫.৩২	শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক	১৯৩
৫.৩৩	আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক	১৯৪
৫.৩৪	আয়ের সাথে গৃহ শিক্ষকের সংখ্যার সম্পর্ক	১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ক) প্রস্তাবনা ঃ

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এই মৌলিক চাহিদাপূরণ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। একটি দেশ তথা জাতির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষা অন্যতম মানদন্ড। মানব সমাজ ও সভ্যতা সতত পরিবর্তনশীল। সুতরাং পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার সাথে খাপ-খাইয়ে চলার জন্য, বিশেষ করে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষিত এবং দক্ষ মানব সম্পদ একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ তথা দেশ ও জাতির অগ্রগতি সম্ভব। এক কথায় বলা যায়, যে দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত সেই দেশ ততবেশী উন্নত এবং সামাজিক শ্রেণী গুলো ও মর্যাদাশীল।[১] তাই কোন দেশের জাতীয় উন্নতির জন্য প্রথমেই উহার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতিদৃষ্টি নিবদ্ধ করা খুবই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত নগন্য। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনগ্রসরতা, যুগোপযোগী শিক্ষানীতির অনুপস্থিতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ইত্যাদি কারণে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় পঁচিশ বছর পর ও শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জিত হয়নি। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ৩২.৪, যা সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অত্যন্ত নগন্য।[২] একথা বলাই বাহুল্য যে, উন্নয়নমূলক সমাজবিজ্ঞানে অনুন্নত দেশের উন্নয়নের অন্যতম নির্ঘন্ট হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয়। আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকগণ পাশ্চাত্য দেশের

---

১ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, শিক্ষা ও পরিকল্পনা, নজরুল এভিনিউ, কুমিল্লা , ১৯৮১, পৃ- ৪

২ Bangladesh Statistical Year Book, 1997, P. 2.

Dhaka University Institutional Repository

অনুকরণে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে অনুন্নত দেশের উন্নয়নের কথা বলে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা জাপান, ইংল্যান্ড ও কোরিয়ার ১০০% ভাগ শিক্ষিতের হারকে মডেল হিসেবে ধরে উন্নয়নের কথা বলেন।

পক্ষান্তরে, নির্ভরশীল তাত্ত্বিকেরা উন্নয়নের আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের তীব্র সমালোচনা করেন। কারণ তারা মনে করেন যে, আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রাচ্যের দেশগুলো পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। কিন্তু নির্ভরশীল তাত্ত্বিকগণ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন মতামত প্রদান করেননি। যদিও তারা উন্নয়নশীল দেশ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোর রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং কাঠামোগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে তারা কোন বস্তনিষ্ঠ পর্যালোচনার প্রয়াস পাননি। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, নৃবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক সকলেই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শিক্ষার সাথে শ্রেণীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণী গুলোর সকলেই সমভাবে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে কিনা বা কোন্ শ্রেণী কি ধরনের শিক্ষার সুযোগ - সুবিধা পাচ্ছে সে সম্পর্কে মতামত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তারা তেমন গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেননি।

অথচ কোন দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা সামাজিক শ্রেণী গুলোর উন্নয়নের জন্য সেই দেশের সামাজিক কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাষ্ট্রের প্রকৃতি , শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণী গুলোর অবস্থান ইত্যাদির বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। আজ যদি আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, শিক্ষা এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত সীমিত হয় পড়ছে। সরকারী কিংবা বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগপাচ্ছে সমাজের গুটি কয়েক উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা। অপরদিকে, সমাজের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দিন দিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োজিত আমলাবর্গ এবং সরকারী কর্মচারীদের সন্তানেরা শিক্ষার অধিক সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতা। পারিবারিক আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

সচ্ছলতার উপর একজন শিশুর শিক্ষার্জন নির্ভরশীল। অতএব একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণীগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ পাওয়া না পাওয়া নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

পাশ্চাত্যের মতো বাংলাদেশ এখনো জটিল শ্রেণী বিভক্ত সমাজ না হলেও এটি শ্রেণী বিভাজনের দিকে দ্রুত ধাবমান হচ্ছে। কিন্তু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা আজও ঢেলে সাজানো হয়নি। দু'শ বৎসরের বৃটিশ শাসনামলে উপমহাদেশে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় উপনিবেশিক শাসন-শোষনের স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী মধ্যস্তরের কেরানীকুল সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, বৃটিশ আমলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল আজও সে ধারা প্রায় অক্ষুন্ন রয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটলেও ঘটেনি। উন্নত দেশগুলো তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছে। তাসত্ত্বেও বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সন্তানদের জন্য শিক্ষাকে দিনদিন দুঃসাধ্য করে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষার উপকরণ যেমন, বই, খাতা, কলম পেন্সিল এর মূল্য ও পরীক্ষার ফি, ভর্তি ফি, বেতন ইত্যাদি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, শিক্ষার গুণগত মান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষারহার বৃদ্ধির পরিবর্তে দিন দিন মানুষকে নিরক্ষতার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্টসমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সামাজিক শ্রেণী গুলোর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য। শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ বিশ্লেষণে সামাজিক স্তরবিন্যাস, রাষ্ট্রের চরিত্র, শিক্ষা এবং সামাজিক শ্রেণীর আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাগুলো অনুন্নত দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ সব সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এ সাহায্য কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে আমি আমার প্রস্তাবিত গবেষণায় আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

ঘ) গুরুত্ব ঃ

যদিও সামাজিক শ্রেণী শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বি, আই, ডি এস, শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। তথাপি আমি মনে করি যে, সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে শিক্ষার সুযোগের সম্পর্ক কি ধরনের তা এসব গবেষণায় প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজের অসচ্ছলতা, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্টানের অনুপস্থিতি এবং শিক্ষার উপকরনের উচ্চমূল্য এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। জনবিজ্ঞানী হারবিসন ও ম্যায়ারএর ভাষায়, "The development of man power is possible through the promotion of the knowledge, skill and capability of the people of the society or the country ."[৩]

তাছাড়া, ১৯৭১ সালের ৩৬ শে মার্চ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার পর নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয় তা সমাধান করতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অকার্যকর মনে হয়। যেহেতু বটোমোরের ভায়ায়, " 'Social structure' is one of the central concepts of sociology,"[৪] সেহেতু সামাজিক শ্রেণী হলো সমাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম উপাদান। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে সামাজিক কাঠামো তথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম উপদান হিসাবে সামাজিক শ্রেণী কিভাবে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার মধ্যেই বর্তমান গবেষনার গুরুত্ব নিহিত।

---

৩ Harbison and Myers, Education, Manpower and Economic Growth, P. 24.

৪ T. B. Bottomore, Sociology, P. 113

Dhaka University Institutional Repository

গ) পদ্ধতি ঃ

শুধু সমাজ কেন, যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । সমাজবিজ্ঞানে একেই পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়। কেননা গবেষণা কে বাস্তব ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এর বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও আবশ্যক।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় একই সাথে এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় । এ প্রসঙ্গে ফরাসী গণিতবিদ হেনরী পঁয়কার বলেন " Sociology as 'the science with the most methods and the fewest results'. This is an unduly harsh judgment. It is true that the work of sociologists over the past century has produced few, if any, high level generalizations which might form the elements of a body of scientific theory."[৫] তবে সেক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বিবেচনায় নিয়ে কোন্ পদ্ধতি বেশী কার্যকর হবে তা গবেষককে বেছে নিতে হবে। সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে আমি প্রধানত দু'টি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি।

আমার বর্তমান গবেষণার বিষয় বস্তুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য প্রথমে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছি। কারণ শিক্ষায় সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান, শিক্ষায় শ্রেণীগত বৈষম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। মানব সমাজের আদিমকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় বহুবিধ সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। তাই আমার বিবেচনায় শিক্ষা ও সামাজিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে জানতে হলে । ঐতিহাসিক পদ্ধতিই অধিকতর উপযোগী। তাছাড়া, গবেষণাকে আরও বস্তুনিষ্ঠ, তথ্য

---

৫ T. B. Bottomore, Sociology, P. 48

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সাময়িকী এবং গবেষণাকর্ম থেকেও তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজণীয়তা উপলব্ধি করেছি।

তাছাড়া, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (purposive sampling) ভিত্তিতে আমি ঢাকা শহরের ভিত্তিতে আমি ঢাকা শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত ৪ টি করে মাধ্যমিক স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজকে নির্বাচিত করেছি। এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি সাপেক্ষে আমি প্রতিটি পর্যায়ে দুটি করে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নিয়েছি। আবার গুণগত মানের ভিত্তিতে দুটি ভাল এবং দুটি তুলনামূলকভাবে কম ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমার বর্তমান গবেষণার জন্য গ্রহণ করেছি। এবং এর সাথে দু'টি ছেলেদের এবং দুটি মেয়েদের স্কুল ও কলেজ নির্বাচন করেছি।

পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি জরিপ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য আমি ঢাকা শহরের চারটি করে স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজ থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্র- ছাত্রীর কাছ থেকে দৈবচয়িত নমুনার ভিত্তিতে প্রশ্নমালার সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা, বেতন, পরীক্ষার ফলাফল, ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়াস পেয়েছি। অন্যদিকে সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান জানার জন্য ছাত্র- ছাত্রীদের অভিভাবকের পেশা, মাসিক আয়, সম্পত্তির মালিকানা, গৃহশিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা ক্ষেত্রে মাসিক ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহও করেছি। সে যা হোক, যেহেতু আমার গবেষণা শুধুমাত্র ঢাকা শহরের কতিপয় হাইস্কুল , ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেহেতু আমার সংগৃহীত তথ্য সমগ্র বাংলাদেশের বেলা প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) পরিধি ঃ

সামাজিক শ্রেণীও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক গবেষণায় আমি মূলত ঢাকা শহরের উপর গবেষণার আলোকে সমগ্র বাংলাদেশের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারণ এ বিষয়ে ঢাকা শহরের বাস্তব পরিস্থিতি জানতে হলে সামাজিক শ্রেণীগুলোর অবস্থান সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ ধারনা থাকতে হবে। সামাজিক শ্রেণীগুলোর সাথে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি এবং তার ইতিহাস শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ নির্দেশপূবক বাংলাদেশের অনুন্নয়নকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান শ্রেণীগত অবস্থান, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার তারতম্য, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈষম্যেরকারণ খুজেঁ বের করার চেষ্টা করেছি। উপযুক্ত বিষয় সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার গবেষণা কর্মকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি মূলত সমস্যাটি সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবৃতি প্রদান এবং এ ধরনের গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, আমার প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক দিক সমূহ, বিশেষ করে বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের চিত্র ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।, চতুর্থ অধ্যায়ে ঢাকা শহরের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছি এবং এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্টানের বিভিন্নস্তরে বিরাজমান সমস্যাবলী সনাক্ত করার চেষ্টা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে ঢাকা শহরের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ও শিক্ষা ব্যবস্থার পার্স্পরিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক রূপ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিচার- বিশ্লেষণ করে বিরাজমান পরিস্থিতি তুলে ধরেছি। পরিশেষে আমি আমার গবেষণা কর্মের একটি উপসংহার প্রদানের চেষ্টা করেছি এবং গবেষণাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক করে তোলার জন্যে আমি আলোক চিত্র, মানচিত্র এবং প্রশ্নমালা সংযুক্ত করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) প্রকল্প সমূহ ঃ

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার সুযোগ ও এর গুণগত তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিষয়টি নিবিড়ভাবে যুক্ত সেহেতু দেখা যায় ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবার সমূহের মাঝে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এর শতকরা হার, মান, সুযোগ ও যোগ্যতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শিক্ষা ক্রমেই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এর গুণগত তারতম্যের দিক থেকে বৈষম্যমূলক হয়ে পড়ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং অভিভাবকের সমাজিক অবস্থান, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত বক্তব্যকে বিবেচনায় রেখে আমি ঢাকা শহরে অবস্থিত কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে শিক্ষা ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত চারটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছি।

১। স্কুল/ কলেজ পরিত্যাগের সাথে সামাজিক শ্রেণীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

২। স্কুল/ কলেজের গুণগত মানের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে।

৩। অভিভাবকদের আয়ের সাথে শিক্ষার পার্থক্য রয়েছে।

৪। সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান।

৫। অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগের তারতম্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত কাঠামো

২.১ শ্রেণীর ধারণা ঃ

একথা সর্বজন বিদিত যে, সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক। আর সেটি বুঝতে হলে 'শিক্ষা' ও 'শ্রেণী' নামক দু'টি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। 'শিক্ষা' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আর 'শ্রেণী' হলো প্রধানত সামাজিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক রূপ। এখানে একথাটিও বলা আবশ্যক যে, সংশ্লিষ্ট সমাজের কাঠামোর সাথে শিক্ষাকে (যা সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান) সম্পর্কিত করতে না পারলে আলোচনা সমাজতাত্ত্বিক রূপ লাভ করতে পারে না। তাই 'শ্রেণী' ও 'শিক্ষার' তাত্ত্বিক বিষয়টির পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরী। অতএব একথা বলাই বাহুল্য যে, সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে শ্রেণী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কোন সমাজের আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত প্রত্যয় গুলো যেমন, ব্যক্তি, সমাজ, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক কাঠামোর মৌলিক সূত্রগুলো বস্তুত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শ্রেণীকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানেও সামাজিক শ্রেণীকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আদিম গোষ্ঠী সমাজ ছাড়া প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু কিছু বৃহৎ জনগোষ্ঠী থাকে, যে গুলো একে অপরের থেকে নানা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক । ক্রীতদাস ও প্রভু, সামন্ত ও কৃষক, পুঁজিপতি ও শ্রমিক এরাই হল সেই সামাজিক গোষ্ঠী যাদের বলা হয়ে থাকে শ্রেণী।[১]

---

১ অরুণ সোম, সমাজবিদ্যা (রুশ ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ) মস্কো, প্রগতি প্রকাশনা, পৃ- ৯১

Acoording to p. w. musgrave, "Social class is a topic to which sociologists have given much attention. Yet to define the term is very difficult and for our purposes here the important concept is that of the socio-economic group. This to closely linked with class, particularly in the marxian sense, since marx's whole theory was firmly based on economic grounds."[২]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, সমাজ বিজ্ঞানে অদ্যাবধি শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব হয়নি। তবে শ্রেণী সম্পর্কিত সকল আলোচনায়ই অর্থনৈতিক স্বার্থকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণী সংক্রান্ত আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। শ্রেণীর কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও মোটামুটি তিনটি মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে শ্রেণী গুলো বিভক্ত। এই মৌলিক উপাদান গুলো হচ্ছে ;

১) অর্থনীতি (Economy); ২) পদমর্যাদা (Status) এবং ৩) ক্ষমতা (Power)।[৩] আর সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী হচ্ছে, " A form of social stratification in which allocation to membership of; and relationship between classes are governed by economic considerations rather than law or religion and ritual pollution."[৪] অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যেখানে শ্রেণী বিন্যাস কতগুলো সমাজিক প্রপঞ্চের মাত্রাগত ভিত্তিতে করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী টি, বি, বটোমোর সামাজিক স্তরবিন্যাস কে সমাজের বাস্তব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে সমাজিক স্তরবিন্যাসের রয়েছে

---

২ P. W. musgrave , The sociology of Education, p. 62

৩ ibid, p. 57.

৪ ibid, p. 57

Dhaka University Institutional Repository

চারটি মৌলিক ধরন। এগুলো হচ্ছে; ১। দাস প্রথা (Slavery) ২। এষ্টেট প্রথা (Estate) ৩। জাতি-বর্ণ (caste) ৪। সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা গোষ্ঠী (Social class and status group)।[৫]

বস্তুত, বটোমোর দাসপ্রথা বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজের দাস ব্যবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। এষ্টেট বলতে সামন্ত সমাজ বিশেষ করে ফরাসী সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাসকে চিহ্নিত করেছেন। আর জাতি -বর্ন হচ্ছে মূলত ভারতীয় দাস- সামন্ততন্ত্রের অধীনে হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা এবং সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিশেষত বৃটেনের পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজে বসবাসকরী জনগোষ্ঠীকে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেমনঃ বয়স লিঙ্গ, আয়, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্তকরণকে বোঝায়। মূলত এই বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি নয়। তাছাড়া, কেউ কেউ আবার বংশ পরম্পরায় নির্ধারিত মর্যাদাকেও স্তর বিন্যাসের ভিত্তি মনে করেন। অবশ্য এ মর্যাদাও আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা প্রত্যক্ষ মর্যাদা (Direct Status) এবং পরোক্ষ মর্যাদা (Indirect Status) সমাজবিজ্ঞানী এফ. পারকিন তাঁর Class Inequality and political order নামক গ্রন্থেও শ্রেণীগত অসাম্য ও রাজনীতি ভিত্তিক মর্যাদার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজে কতগুলো বিশেষ প্রপঞ্চের ভিত্তিতে ব্যক্তির পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ সম্পদ, শিক্ষা, পেশা, জাতিগত সত্তা, জীবনধারা এবং ক্ষমতা ইত্যাদি। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারও ব্যক্তির আয়, সম্পত্তি, জীবনধারা পদ্ধতি, সম্মান এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

---

৫ T. B. Bottomore, sociology : a guide to problems and literature, p. 185

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ করেছেন। মূলতঃ সমাজে যখন থেকে প্রয়োজনের অধিক খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী উৎপাদন শুরু হয় তখন থেকেই স্তরবিন্যাসের বিকাশ ঘটে।

সমাজবিজ্ঞানী এম. এম. টুমিন তাঁর Social Stratification নামক গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্য সম্পদের বন্টনকে (Distribution of resource) দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, সম্পত্তি, ক্ষমতা ও সম্মান হচ্ছে প্রত্যেক সমাজে স্তরায়নের ভিত্তি। তিনি অবশ্য স্তরবিন্যাসের জন্য চারটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন।[৬] এ সব হচ্ছে ঃ১। পৃথকীকরণ (Differentiation) ২। পদমর্যাদা নির্ধারণ (Ranking) ৩। মূল্যায়ন (Evaluation) এবং ৪। পুরস্কৃত করণ (Rewarding)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রেণী বিশ্লেষণে সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রাসঙ্গিক কারণেই শ্রেণীর আলোচনার তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে স্তরবিন্যাসের আলোচনা এসে যায়। স্তরবিন্যাস আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কার্লমার্কস যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন সেখানে ম্যাক্স ওয়েবার সম্পত্তি ক্ষমতা ও সম্মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কসের মতে অবশ্য স্তরবিন্যাসের উক্ত তিনটি উপাদানের মূলে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা। উল্লেখ্য, ম্যাক্স ওয়েবার সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পত্তির গুরুত্ব মোটেই হ্রাস করেননি। তিনি যা করেছেন তা হল সম্পত্তির সাথে ক্ষমতা ও সম্মান কে সংযুক্ত করেছেন।

রালফ ডাহ্রেন ডর্ফ তাঁর Class and class conflict in Industrial society নামক গ্রন্থে এবং এথনী গিডেন্স তাঁর The class structure of the advanced societies গ্রন্থে সামাজিক স্তরায়ন সম্পর্কিত ধারনার বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রালফ

---

৬ M. M. Tumin, Social Stratification p. 29

Dhaka University Institutional Repository

ডাহ্‌রেন ডর্ফ সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস বিশ্লেষণে কার্লমার্কস এবং ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণা দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, তাঁর মতে, "A Structurisation of classes has occured, i. e the two broad classes of marx are structured or divided within themselves."[৭] এথনী গিডেন্সের মতে আধুনিক সমাজে দু'ধরনের স্তরায়ন লক্ষ্য করা যায়; যথা- পদমর্যাদা ভিত্তিক স্তরায়ন (based on status categories) এবং শ্রেণী ভিত্তিক স্তরায়ন (based on classes)।[৮]

সামাজিক শ্রেণীর আলোচনায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য একটি মৌলিক বিষয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের তাত্ত্বিক আলোচনা কে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণথেকে আমরা আলোচনা করতে পারি।

যেমন, মার্কসের দ্বান্দ্বিক ধারণা (Conflict view) , ম্যাক্স ওয়েবারের বহুমাত্রিক ধারণা (multi - dimentional view) , এবং ডেভিসের ক্রিয়াবাদী ধারণা (functional view)

শ্রেণী সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণা

বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের ভাষায়, "শ্রেণীই হলো স্তর বিন্যাসের একমাত্র ভিত্তি।" তাঁর মতে সামাজিক স্তর বিন্যাসকে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড় করতে হয়। অর্থাৎ সমাজের শ্রেণী কাঠামোর মধ্য দিয়ে স্তরবিন্যাস বুঝা সম্ভব। সামাজিক উৎপাদনের উপায়কে কেন্দ্র করে মার্কস সমাজের মানুষকে দুটি প্রধান শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন, যথা- ১) উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং ২) যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয়।

---

৭ Ralf Dahrendorf, Class and class conflict in Industrial society , P. 64.

৮ Anthony Giddens, The class structure of the advanced societies. p. 47

সেজন্য যেকোন উৎপাদনমূলক সমাজ ব্যবস্থায় একটা দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থকে।[৯] যদিও মার্ক মার্কসের শ্রেণী প্রত্যয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কিন্তু তাঁর কোন রচনায়ই শ্রেণীর কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তাঁর মতে শ্রেণী হচ্ছে, "Large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production by their relation to means of production, by their role in the social Organization of the share of social wealth of whcih they dispose and the mode of acquiring etc."[১০]

মার্কস শ্রেণী বলতে মূলত সামাজিক শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন, যার ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠেছে। শ্রেণী সম্পর্কে লেলিন বলেন, "Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to different place they occupy in a definite system of social economy."[১১] অর্থাৎ লেনিনের ভাষায়, "শ্রেণী নির্ধারিত হয় সামাজিক উৎপাদনে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অবস্থান, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে। " আরো সহজভাবে বলতে গেলে শ্রেণী হচ্ছে, "a group of people" যাদের সামাজিক উৎপাদনে ব্যবস্থায় সম্পাদের অসমতার জন্য পার্থক্য সূচক অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

এর পরিণতিতে একদল লোক অন্যদলের শ্রম আত্মসাৎ করে তাদের শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। তাই মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রতিটি শ্রেণীকে একটি নির্দিষ্ট, সময়ের সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন প্রণালীর

---

৯ International Encyclopedia of social science, vol. 15, p. 289.

১০ V. I. Volkov, A Dictionary of political Economy, p. 43

১১ V. I. Lenin,Collected works, Vol. 29, p. 421

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, সমাজিক সংগঠনে শ্রেণী সমূহের মাঝে পার্থক্যের মৌল লক্ষণ গুলো হলো উৎপাদন ব্যবস্থায়, তাদের অবস্থান। কারণ প্রতিটি শ্রেণীর উৎপাদনের উপায়ের সাথে থাকে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক।

লেনিনের কথায়, " A social class in Marx's terms is only aggregate of persons who perform the same function in the organization of production, "Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and Journey man, in a word, oppressor and oppressed." are the names of social classes in different historical periods. These classes are distingushed from each other by the difference of their respective positions in the economy."[১২]

মার্কস মূলত পুঁজিবাদী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজ বিশ্লেষণে শোষণ প্রক্রিয়া, উৎপাদিত পন্যের বন্টন ও পুঁজি সঞ্চয়নের দিক থেকে শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া এবং সর্বহারা নামক দুটো প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত,মার্কস তাঁর পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণাটি আদি সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন এবং ধ্রুপদী-অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর কাছ থেকে গ্রহন করে একে বিজ্ঞান সম্মত রূপ দান করেন। পুঁজিবাদী সমাজে জটিল শ্রমবিভাজনের ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তন আসে। মার্কস আসলে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণায় এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর এখানেই মার্কসের সাথে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের প্রকৃত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের Manifesto of the communist party, Das capital, The class struggles in France, Revolution and counter revolution in

---

১২ Quoted in Bendix and lipset, class, status and power , p. 26

Dhaka University Institutional Repository

Germany ইত্যাদি গ্রন্থে ইত্যাদি গ্রন্থে সামাজিক শ্রেণী সমূহকে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের আদর্শ নমুনা ('Ideal type') হিসেবে ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদকে বিবেচনা করেছেন। এর পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স ও জার্মানীর সমাজ কাঠামোকেও পর্যালোচনা করেছেন।

পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মৌল কাঠামোকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনি উপরি কাঠামোকেও কম গুরুত্ব দেননি। মার্কস সমাজের মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। আর সেজন্য টি. বি. বটোমোর বলেছেন যে, "Marx never considered the independence of base and super structure as a relation of cause and effect."[১৩] এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে কার্ল মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এঙ্গেলস একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। এঙ্গেলস লিখেছেন, Political, philosophical religious, literacy, artistic etc. development is based on economical development. But all these react upon one another and also upon the economic base. It is not that the economic position is the cause and alone active white every thingelse only have a passive effect."[১৪] তবে এখানে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমাদের সকলের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের Manifesto of the communist party নামক গ্রন্থে এবং মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে তাঁরা শ্রেণীকে বুঝানোর জন্য stratum ও Estate এ দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁরা সামন্তবাদী বিশেষ করে ফরাসী সামন্ত সমাজের শ্রেণী কাঠামোকে বুঝানোর জন্য এস্টেট শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর পাশ্চাত্যের বিশেষ করে ইংলন্ডের পুঁজিবাদী সমাজের

---

১৩ T. B. Bottomore, Marxist sociology. p. 68

১৪ F. Engels, letter to Hunz stakenburg in Marx and Engels, vol. 2, p. 516

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে class (শ্রেনী) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে এ কথাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মার্কস Social class এর পরিবর্তে কখনো কখনো social group শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আবার আলোচনার সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও major class and minor class অথবা basic class and non- basic class এ ধরনের শব্দও প্রয়োগ করেছেন।[১৫] মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণী বিভাগের মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেজন্য সামাজিক শ্রেণী কাঠামো বিশ্লেষণে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানে মৌল শ্রেণী (Basic class) এবং অমৌল শ্রেণীর (non- basic class) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

মৌল শ্রেণী (Basic class) যারা সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত তারা মৌল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি উৎপাদনমূলক সমাজেই দুটো প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ- দাস সমাজে দাস ও দাস মালিক, সামন্ত সমাজে ভূমিদাস ও সামন্ত প্রভু , এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারা। তবে বুর্জোয়া সমাজেই শ্রেণী দ্বন্দ্ব চরম রূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেন, " Our epoch the epoch of the bourgeoisic, possesses, however, this distinctive feature; it has simplified the class antagonisms. society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other : bourgeoisie and proletariat."[১৬] অমৌল শ্রেণী (non- basic class) ঃ অমৌল শ্রেণী গুলো পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রণালীর জের হিসেবে টিকে থাকে। যেমন ঃ দাস সমাজে মৌল শ্রেণীর সংগে ছিল কৃষক, বনিক, শ্রমজীবী ইত্যাদি অমৌল শ্রেণী। এছাড়া রয়েছে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, ক্ষুদে খামার মালিক, কারুজীবী, দোকানদার ইত্যাদি।

---

১৫ আইয়ে মার্কোভা ভ. রাতনিকভ, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮ পৃঃ ২৬

১৬ Karl marx and F. Engels, Manifesto of the communist party p. 80

Dhaka University Institutional Repository

সে যা হোক, উৎপাদনমূলক শ্রেণী সমাজে মৌল ও অমৌল শ্রেণীর মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। মৌল শ্রেণী ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে অমৌল শ্রেণীতে পরিণত হয়। আবার অমৌল শ্রেণী বিবর্তনের ধারায় মৌল শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে। সেজন্য প্রতিটি উৎপাদনমূলক সমাজেই প্রধান দুটি শ্রেণীর বাহিরে ও কতগুলো মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বটোমোর বলেন, "The growth of new middle classes comprising office workers, supervisors, managers, technicians, scientists, any many of these who are employed in providing services of one kind or another which has resulted from ecomomic development, manifests the greater complexity of social stratification in modern industrial societies, and it introduces, or re-introduces as an important element of stratification social prestige based upon occupation, consumption and style of life".[১৭]

মার্কস মূলত ফরাসী কৃষক সমাজের বিশেষ প্রেক্ষিতে মানব সমাজে শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কে দুটি শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করেন ঃ একটি 'class -in - itself' এবং অন্যটি 'class -for- itself' প্রথমটি হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনাহীন শ্রেণী। এরা নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নে সচেতন নয় এবং শ্রেণী সংঘাতে লিপ্ত হয় না। যেমন, প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "A class - in- itself is a class consisting those of people occuping the same relation to the means of prodction, irrespective of their acknowledgement or awareness of this. They are lacking in any common class identity. political mobilization or other ideological bonds."[১৮] অন্যদিকে দ্বিতয়িটি হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শ্রেণী। এরা আপন স্বার্থ সম্পর্কে

---

১৭ T. B. Bottomore, Classes in modern society , p. 25

১৮ David lee and Howard newby, The problems of sociology. pp. 122-23

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন এবং শ্রেণী সংঘাতে লিপ্ত হয়ে স্বীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অন্যকথায় বলা যায়, "A full fledged consciousness class pursuing its our interest against those of the opposing class, aware of their common identity and organized politically."[19]

শ্রেণী সংগ্রাম ও তার কারণ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণা

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles."[২০] মার্কস এবং এঙ্গেলস Maifesto of the communist party নামক গ্রন্থে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন। তাদের মতে মানব ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস। মার্কসবাদীরা সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণে তিনটি গুরুত্ব পূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ যথা-

১) শ্রেণী চেতনা (Class consciousness) ২) শ্রেণী সংহতি (class. solidarity) ; এবং ৩) শ্রেণী বিরোধ (class. conflict)

উৎপাদন সংগঠন ছাড়াও শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস সামাজিক শ্রেণীকে অবলোকন করেছেন। তিনি বলেছেন, সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্বের জন্য উৎপাদন সংগঠন প্রয়োজনীয় ভিত্তি ভূমি হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। মার্কসের মতে, সামাজিক শ্রেণী বিকাশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো; "আর্থিক লাভের জন্য পৌনঃ পৌনিক সংঘাত, শ্রেণী সদস্যদের মধ্যে দ্রুত ভাবের আদান-প্রদান, শ্রেণী চেতনার উন্মেষ এবং শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ।

---

১৯ ibid, pp, 122-23

২০ Marx and Engels, Manifesto of the communisl party, p.7

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার শ্রেণী সম্পর্কে বলেন,"A class as being composed of peop;le who have life chances in common as determined by their power to dispose of goods and skills for the sake of income"[২১] মার্কস ওয়েবারের মতে বাজারের অস্তিত্বের সংগে সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। আর অর্থনৈতিক স্বার্থই সৃষ্টি করে শ্রেণী। একই শ্রেণী অবস্থানে বিরাজমান যে কোন একটি জনসমষ্টিই শ্রেণী বলে গন্য হতে পারে। "সম্পত্তিবান" কিংবা "সম্পত্তিহীনতা" হলো যেকোন শ্রেণী বিভাগের মৌল ভিত্তি। বাজারের অবস্থানই শ্রেণীর অবস্থানকে নিরুপণ করে। অর্থাৎ বাজার -অবস্থা বিদ্যমান থাকলেই শ্রেণীর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

মার্কস যেখানে উৎপাদন প্রণালী ও উৎপাদন সম্পর্কের সাথে যুক্ত করে শ্রেণীকে বিশ্লেষণ করেছেন, ওয়েবার সেখানে বাজার (market), বন্টন (Distribution) এবং উপভোগ (consumption) ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ওয়েবারের মতে, শ্রেণী হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যার রয়েছে অভিন্ন জীবন সম্ভবনা (common life chances) , আয়ের সুযোগ গ্রহন ও পণ্যের অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থ, আর অস্তিত্ব নির্ভর করছে 'condition of commodity' তথা 'Labour market' এর উপর। উক্ত জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই রয়েছে অভিন্ন শ্রেণীগত অবস্থান (common class situation)। আর এই class situation আবার market situation এর উপর নির্ভরশীল।

---

২১ United Nations (eds). International Encyclopedia of social science. 1st edition, vol. 1 and 2, p. 300

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবার প্রধানত এই তিনটি প্রত্যয় ব্যবহার করেন। ওয়েবার স্তরবিন্যাসকে তিনটি মাত্রা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের ছকটি দ্রষ্টব্য ঃ

Social Stratification	→	Ecomomic dimension → class
	→	social dimension → status
	→	political dimension → power

যেহেতু ম্যাক্স ওয়েবার শুধুমাত্র class (শ্রেণী) এর উপর ভিত্তি না করে status (পদমর্যাদা) এবং power (ক্ষমতা) এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন সেহেতু তাঁর শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণাকে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী (pluralistic approach) বলা যায়। ওয়েবার শ্রেণীকে উৎপাদনের সাথে, পদমর্যাদাকে উপভোগের সাথে এবং বন্টনকে ক্ষমতা তথা রাজনীতির সাথে যুক্ত করে দেখেছেন। ওয়েবারের শ্রেণী সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে বাজার পরিস্থিতি (market situation)। ওয়েবারের মতে, " Both of these capacities can only wise with in the content of a market, so that an individual class is essentially, his or her market situation."[২২]

ম্যাক্স ওয়েবার সামাজিক শ্রেণীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

১। সম্পত্তিবান শ্রেণী (propertied class); ২। মুনাফা ভোগী ব্যবসায়ী শ্রেণী (commercial class with profit motive); ৩। সামাজিক শ্রেণী (social class)।[২৩] এখানে একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ম্যাক্সওয়েবার সামাজিক শ্রেণীকে অনেকটা সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করেছেন, যাদের প্রত্যেকই এক একটা মর্যাদা গোষ্ঠী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবন ধারা। পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওয়েবার সামাজিক শ্রেণীকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করেছেন। যেমন,

---

২২ Max weber, class, status and party, p. 66

২৩ Max weber, Economy and society , vol. 1, p. 79,

Dhaka University Institutional Repository

১। শ্রমিক শ্রেণী (working class)

২। ক্ষুদে বুর্জোয়া (petty Bourgeoisie)

৩। উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা বিহীন বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণী (propertyless and specialists Intelligentsia)

ম্যাক্স ওয়েবার যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্লেষণে কার্ল মার্কসের পন্য উৎপাদন ও পুজি সংগ্রহের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তথাপি এ ব্যবস্থায় শোষণের প্রক্রিয়াকে তেমন গুরুত্ব দেননি। মার্কস বর্নিত শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণী স্বার্থ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা সমূহের সাথে ওয়েবার সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেন না ওয়েবারের মতে, "class interest generated action by individuals in pursuit of those interests but this only assumes the form of class action and struggle under certain conditions."[২৪]

ওয়েবার মনে করেন শ্রেণী সচেতনতার পরিণতি শ্রেণী সংগ্রাম নয়, তথা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও নয়। কার্ল মার্কস শ্রেণী সচেতনতা বলতে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থগত দ্বন্দ্বকে সনাক্ত করেছেন, এই দ্বন্দের ফলে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কায়েম হবে। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় ওয়েবার তাঁর শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণায় মার্কসের অনেক কিছু বর্জন করেছেন। তিনি মূলত শ্রেণীর অবস্থান এবং মর্যাদা গোষ্ঠী সম্পর্কে সূক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যন্ত সামাজিক শ্রেণী ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি ।

---

২৪ Michael mann (ed), Macmillan Encyclopedia of sociology, vol. 1 and 2, 1985, p. 47

Dhaka University Institutional Repository

সেজন্য ম্যাক্স ওয়েবারের শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষন করতে যেয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "এর ব্যাখ্যার মাঝে বাক্যবিন্যাস ও বাচনভংগির কৌশলটাই বড় হয়ে উঠেছে। বক্তব্য তেমন প্রাঞ্জল হয়নি। মার্কস এ রকম কোন কৌশলের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকের স্বার্থ চেতনা দিয়ে তিনি শ্রেণী শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অনেক সহজ বোধ্য ও বিজ্ঞান সম্মত । অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানী নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ শ্রেণী কথার ব্যাখ্যা করেও একই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।"[২৫]

পরিশেষে বলা যায় , শ্রেণী বিশ্লেষণে মার্কস যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন ওয়েবার সেখানে সম্পত্তি, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদির উপর প্রধাণ্য দিয়েছেন। এথনী গিডেন্স ,মার্কস ও ওয়েবারের শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা দুটির মধ্যে একটি সুন্দর পার্থক্য আমাদের সামলে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, " At the risk of some over simplification, it can be said that, whereas marx's abstract model of capitalist development proceeds from the 'economic' to the 'political', weber's model is derived from the opposite process of reasoning, using the 'political' as a framework for understanding the economic"[২৬] অর্থাৎ মার্কসের শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা অর্থনীতি থেকে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে,আর ওয়েবারের শ্রেণীর ধারণা রাজনীতি থেকে অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। আর এখানেই দু'জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী পেরেটো, তাঁর এলিট তত্ত্বকে 'Residues and Derivation' নামক দুটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসকে উচ্চমানের ব্যক্তির প্রবাহ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

---

২৫ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, পৃঃ ৪

২৬ Anthony Giddens, The class structure of the advanced societies, p. 47

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমগ্র সমাজকে দু'ভাবে বিভক্ত করেন। যেমন, এলিট গোষ্ঠী (Elite group) ও যারা এলিটনা এমন গোষ্ঠী (Non- elite)[২৭] পেরেটোর মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তাঁর কথায় 'History is a grave yard of aristrocracies'.অর্থ্যা ইতিহাস হচ্ছে অভিজাত তন্ত্রের সমাধিক্ষেত্র। সেহেতু আদিম যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কোন মানব সমাজই স্তরবিন্যাসহীন নয় সেহেতু পেরেটোর সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি সামাজিক প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষমতা, বিত্ত নয়। তিনি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে সামজিক প্রভাব ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সম্পত্তির সমতুল্য উপাদান হিসাবে বিবেচনা করেন।[২৮] এলিটকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- ১) শাসনকারী এলিট (Governing elite) যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে নিয়োজিত; ২) অশাসনকারী এলিট (Non- governing elite) যারা শাসনকার্যে যুক্ত নন।

পেরেটোর মতে উপরে বর্ণিত দুটি এলিট গোষ্ঠীই সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। যারা এলিট নয় তারা রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। পেরেটো বলেন, এলিট হলো উচ্চ শ্রেণী এবং নন-এলিট হলো নিম্নশ্রেণী শাসক ও শোষিতদের অভ্যন্তরীন অবস্থানে অসংহতি দেখা দেয়। যখন শাসনকারী এলিটরা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অসমর্থ হয় তখন অ - শাসনকারী এলিটকরা নন-এলিটের সাথে যুক্ত হয়ে শাসনকারী এলিটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ফলে শাসনকারী এলিটের পতন ঘটে এবং অ- শাসনকারী এলিট ক্ষমতায় আসে। এভাবে এলিটের চক্রাকার আবর্তন (Circulation of Elite) মানব সমাজে চলতে থাকে।[২৯] মস্কাও মানব সমাজকে দুটো শেণীতে বিভাক্ত করেন। ১) শাসক ও ২) শোষিত। তবে তিনি শাসক ও শোষিতের মাঝখানে একটি অপরিহার্য মধ্যবর্তী সামাজিক স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর স্তরবিন্যাসের ভিত্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা। ফলে "শাসক শ্রেণী" শব্দটি তাঁর ভাষায় রাজনৈতিক শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে।[৩০]

---

২৭ I. M. Zeitlin, Ideology and the development of sociological theory, p.

২৮ রংগলাল সেন, "সামাজিক কাঠামোর তত্ত্ব ও তার প্রত্যয়গত সমস্যা," ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ ৪০- ৪১

২৯ I. M. Zeitlin, Opcit, P. 188

৩০ রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১

Dhaka University Institutional Repository

২.২ শিক্ষার ধারণা

শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ ব্যক্তির জীবনে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনাই হলো শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার যেমন বিভিন্ন স্তর আছে তেমনি অগ্রগতিরও রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। জাতীয় অগ্রগতির পর্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উচ্চ শিক্ষা জাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করে। আর ঐ উচ্চ শিক্ষাকে প্রভাবিত করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি শিক্ষাস্তর। শিক্ষার রূপ প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক দুইই হতে পারে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ শিক্ষার একাধিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

'Education' শব্দটি এসেছে মুলত ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে । যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'to lead out or bring forth': শিক্ষাকে আমরা নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি ঃ

ক) জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষা;

খ) জীবন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা;

গ) প্রতিটি ব্যক্তির মেধা শক্তি বিকাশের জন্য শিক্ষা ;

ঘ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ;

ঙ) দিক নির্দেশনা, পরিচালনা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা; এবং

চ) সংস্কৃতায়নের গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান হিসেবে শিক্ষা।[১]

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা হচ্ছে এমনি একটি প্রক্রিয়া, বিশেষ করে যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রস্তুত করতে পারে। শিশুর জন্মের পর থেকে অর্থ্যাৎ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার কোন শেষ নেই। আর এটা পরিবার, খেলার সাথী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি

---

১ A. S. Seetharama, Phiolosophies of Education pp. 11-12

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, সময়, সংস্কৃতি এবং সমাজ কাঠামো ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে ও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এখন আমরা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণাকে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত, ধারণাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, যে, "By education I mean that training, which is given by suitable habits to the first instincts of value in children, when pleasure and pain are rightly implanted in non- rational souls. The particular training in respect of pleasure and pain, which leads you to hate and love what you ought to hate and love is called education."[২] প্লেটো তাঁর ' The Republic', 'The Dialogues' 'Thl haws' নামক গ্রন্থ সমূহে শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর "The Republic" গ্রন্থে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজের কোন শ্রেণীর লোকের জন্য কি ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন তা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন। প্লেটোর মতে প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর নির্ধারিত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ কবরে। সে অনুসারে দার্শনিক রাজা বা শাসক শেণীর জন্য যে শিক্ষা উৎপাদক শ্রেণীর জন্য সেই শিক্ষা উপযোগী নয়। তিনি আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ও বলেন।

প্লেটোর পরে তাঁর প্রিয় ছাত্র এরিষ্টল বলেন, শিক্ষা দেহ মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও চরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে। তাঁর মতে, "Education is the creation of soundmind in a sound body. It develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the

---

২ Merrit. M. Thomson, The History of Education , p. 34

Dhaka University Institutional Repository

contemplation of supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists."[৩]

প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের মতে," People can be good and live together peacefully only if their mind were shaped by education and clear rules of conduct."[৪] কনফুসিয়াসের মতে শিক্ষাই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে দেয়া উচিৎ। কেননা প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই প্রতিভা লুক্কায়িত আছে, যার বিকাশের মাধ্যমে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হবে।

আধুনিককালেও অনেক শিক্ষাবিদ ও চিন্তানায়ক শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উনবিংশ শতাব্দী তথা আধুনিক ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন, "Education is the manifestation of perfection already in man."[৫] অর্থাৎ শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়, বিবেকানন্দ অবশ্য অন্তর্নিহিত সত্তা বলতে অধ্যাত্মভাবকে বোঝোতে চেয়েছেন। বেদান্ত দর্শন মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্তা বলতে অধ্যাত্মভাবকে বোঝাতে চেয়েছেন। বেদান্ত দর্শন মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যা সনাতন তা হল তার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মভাব। তই বিবেকানন্দ বলেছেন, "We need an education that quickens, that vivifies, that kindles the urge of spirituality inherent in every mind."[৬]

---

৩ উদ্ধৃত ; সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, পৃ- ৯

৪ The world book Encyclopedia, Vol. 4, p. 171. 1985

৫ পূর্বোক্ত, সুশীল রায়, পৃ. ৭

৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৭

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মা গান্ধীর মতে, "শিক্ষা হল ব্যক্তির দেহমন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস।" (By education I mean an alround drawing out of the best in child and man- body, mind and spirit)[৭] শিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তাবিদদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায় যে, এর মূলে আছে বিশ্ব চেতনাবোধ তথা অধ্যাত্ম- চেতনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, "The best function of education is to enable us to realize that to live as a man is great requiring profound, philosophy for its ideal, poetry, for its expression and heroism in its conduct."[৮]

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খীম শিক্ষাকে একটি অন্যতম সামাজিক প্রপঞ্চ (Social Phenomenon) বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা সমাজস্থ মানুষ কে পরিবর্তিত সমাজ ওসভ্যতার সাথে খাপ- খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাঁর কথায় " Education is the influence exercised by adult generations on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both political society as a whole and the special milieu for which he is specifically destined."[৯]

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার শিক্ষাকে সমাজিক মর্যাদা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, "Every system of education aims at

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, ভুজঙ্গে ভূষনে, পৃ- ৪২

৯ Emile Durkheim, Education and Sociology, p. 71

Dhaka University Institutional Repository

cultivating the pupils for a particular conduct of life characteristic of and suitable for a decisive status group in a particular structure of domination , identifiable at some point along with charismatic, rational bureaucratic continuum."[১০]

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অ্যাডামস্ বলেছেন, " Education is a conscious and deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other by the communication and manipulation of knowledge."[১১] অর্থাৎ শিক্ষা হল এমন একটি সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে তার কিছু আচরণের পরিবর্তনের ঘটে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার অর্থ দেশ, কাল ও ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তাই বর্তমান কারে শিক্ষার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে হলে তার কোন একটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রাচীন চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা ছিল দ্বিমেরু প্রক্রিয়া (Bi-Polar), তথা একদিকে শিক্ষক, এবং অপর দিকে শিক্ষার্থী; একদিকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অন্যদিকে অনভিজ্ঞ অবার্চীন শিশু। এই ধরনের সম্পর্কের উল্লেখ আমরা পাশ্চাত্য দেশে যেমন পাই, তেমনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা চিন্তার মধ্যে ও পাওয়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন।

---

১০ Gerth and Mills (eds), From Max werber Essays in Sociology pp.426- 27.

১১ উদ্ধৃত ঃ সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, পৃ- ৮

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষকের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চায়িত হয়। জ্ঞানই তাঁদের মধ্যে আত্মিক সংযোগ ঘটায়। সে যা হোক, আধুনিক চিন্তা ধারা অনুযায়ী শিক্ষা হল ত্রিমেরু প্রক্রিয়া (Tri- polar process) এর তিন মেরুতে শিক্ষক, শিশু ও সমাজের অবস্থান লক্ষণীয়। এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার সাধ্যমেই শিক্ষা সুসংগঠিত হয়। শিক্ষক সমাজের চাহিদার দিক বিবেচনা করে শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলবেন। অতএব বলা যায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ঠ সমাজের কাঠামোর সঙ্গে নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এই তিন সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়া সুসংগঠিত না হলে শিক্ষা সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। উল্লেখ্য, প্রাচীনও মধ্যযুগের শিক্ষা চিন্তা যে, একেবারে বাস্তবতা বর্জিত তথা সমাজ নিরপেক্ষ ছিল তা কিন্তু নয়। আধুনিক কালে এ ক্ষেত্রে যে নূতনত্ব দেখা যাচ্ছে তা হল এই যে, সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নটি শিক্ষা ব্যবস্থা আগের চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এখানেই শিক্ষার সাথে সামাজ কাঠামো তথা শ্রেণীর সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

২.৩ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা

মানব শিশু জন্মসূত্রে যে কোন একটি সমাজের সদস্য পদ লাভ করে। সে সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিবেশে বিকাশলাভ করে। যে সামাজিক পরিবেশে শিশু জন্ম গ্রহণ করে সে স্বাভাবিকভাবেই এর সাথে নিজেকে খাপ্ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়াস পায়। তার বিকাশের পর্যায়ে যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন ঃ জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিশু পরিবারের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। মানব শিশু জন্মের পর থেকে সমাজের বসবাসের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় বিকশিত হওয়ারকৌশল আয়ত্ব করে তাকেই সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিকীকরণ বলে অভিহিত করেছেন। অথ্যাৎ যে প্রক্রিয়ায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ব্যক্তি সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের উপায়ের সাথে পরিচিত হয় তাকে সমাজিকীকরণ বলা হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ তার নিজের বৈশিষ্ট্য গুলো পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চলিত করে। অতত্রব বলা যায়, সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া। কারণ এর মাধ্যমে সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং সমাজিক প্রথা পদ্ধতি পালিত ও সংরক্ষিত হয়।

একথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে যথাসাধ্য সহায়তা করা। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা সমাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমাজিকীকরণের তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর পরিবার ও শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় সমাজ কাঠামোর অন্যতম কর্ম নির্বাহী পূর্বশর্ত। এখানে বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিনস্ বার্গের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রাথমিক বলে গণ্য হতে পারে। তিনি বলেন, "The study of social structure is concerned with the principal forms of social organization, i.e. types of groups, associationg and institutions and the complex of these which constitute societies."[১] গিনস্‌বার্গের কথায় সামাজিক কাঠামোর পাঠে প্রধান সামাজিক সংগঠন তথা গোষ্টী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিবেচনায় নিতে হয়। আর এসবের জটিল রূপই সমাজ গঠন করে। এখানে সম্পত্তি, পরিবার, শিক্ষা, রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রভৃতি সমাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী বটোমোরের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "It can be shown that the existence of human society requires certain arrangements or processes; or, . . . pre- requisities of society. The minimum requirements seem to be :

(i) A system of communication (ভাবের আদান- প্রদান ব্যবস্থা);

---

১ Morris Ginsberg, Reason and Unreason in society,p. 1

Dhaka University Institutional Repository

ii) An economic system, dealing with the production and the allocation of goods.(অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে) ;

iii) Arrangements (including the family and education) for the socialization of new generations (নূতন প্রজন্মের সামাজিকীকরণের জন্য পরিবার ও শিক্ষা ব্যবস্থা);

iv) A system of authority and of distribution of power (ক্ষমতার ভাগ- বাটোয়ারা ও কর্তৃত্ব ব্যবস্থা); এবং

v) A system of ritual (ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান ব্যবস্থা)।[২]

উপরে বটোমোর বর্ণিত সমাজের কর্মনির্বাহী পাঁচটি পূর্বশর্তের তিন নম্বরটি হচ্ছে সমাজিকীকরণ, যা মূলত শিক্ষা ও পরিবারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এরই সূত্র ধরে আমি এখন সমাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনার প্রয়াস পাব।

ক) <u>পরিবার</u> ঃ একটা নবজাত শিশু যত বাড়তে থাকে ততই তার অভিজ্ঞতার জগতের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এই সময় সে পরিবারের বড়দের কে অনুকরণ করতে থাকে। সাধারণত তিন বৎসর পার হলে বাবা মা ছেলেমেয়েদের কে বর্ণমালার সাথে পরিচয় করাতে শুরু করেন। অনেকে মুখে মুখে বিভিন্ন শব্দ শিখান। অর্থাৎ জ্ঞানের জগতে তাকে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করেন। পরিবারে শিশু তার মা-বাবা ভাই বোনদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে বর্ণমালার সাথে প্রথম পরিচিত হয়। সে বিভিন্ন নিয়ম কানুন শিখতে থাকে, পরিবেশ সম্পর্কে তাকে ধারণা দেওয়া হয়। কাজেই পরিবার হল প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, এখানে তার আচার-আচরন, চাল- চলন, ও রীতি-নীতি আয়ও করার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ঘটে মূলত শৈশব হচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে গঠনোপযোগী সময়। ইংরেজ দার্শনিক

---

২ T. B. Bottomore, <u>Sociology</u> pp. 115-116 (1975)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ বলেছেন, শিশুদের মন হচ্ছে" " Tabula Rosa" একটা সাদা কাগজের পাতা, শৈশবে এই সাদা কাগজে যে অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে তার ফল হয় অনেক দীর্ঘ স্থায়ী,[৩] এই সময় প্রত্যেক শিশুর মধ্যে একটা নিজস্ব জীবন ভঙ্গি গড়ে উঠে, যা পরবর্তী জীবনে তার সমস্ত কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। শিশুর পরিবেশ তাকে ভালও করতে পারে, আবার খারাপ ও করতে পারে। সুতরাং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে মাতা -পিতা - ছেলে মেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেন সেভাবেই সন্তানেরা গড়ে উঠে। যদি মাতা-পিতা সন্তানদের কে ভাল আচার আচরণ, চাল- চলন, রীতি-নীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেন এবং সৎ ও ন্যায় পথে চলার উপদেশ দেন তাহলে তারা সেই শিক্ষা গ্রহণ করে জাতির ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হতে পারবে এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হবে। বস্তুত, সমাজ ও সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে শিশুকে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান মাধ্যমে হচ্ছে পরিবার ও বিদ্যালয়।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ শিশুর বয়স যখন ৩-৪ বৎসর হয় তখন মাতা পিতা তাকে স্কুলে পাঠান। তখন থেকেই তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ঘটে।পরিবারে শিশুর একটা মৌলিক ব্যক্তিত্ব গড়ে গঠে এবং সে যখন স্কুলে আসে সে তার সেই মৌলিক ব্যক্তিত্বকে সাথে করে নিয়ে আসে। শিশুকে তার স্কুলে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ- খাইয়ে নিতে হয়। পরিবর্তিত পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যদি স্কুলকে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায়, "For the society, the school preserve the cultural heritage for the individual, the school pass on or incalcutes the cultural heritage. Thus the broad meaning of education of socialization. The process whereby persons are acesstuated into a human community. The main aim of schooling is to produce human beings whom at best, will perpetuate or improve the present society, or who, at worst, will not destroy the society,

---

৩ জহিরুল হক, সমাজ মনোবিজ্ঞান, পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository

its values and structure."[৪] সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির ভেতর সঞ্চারিত করে। বিদ্যালয় এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারে যারা বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধনে সক্ষম তারা কখনই সমাজ এবং তার মূল্যবোধ ও কাঠামোকে ধ্বংস করবে না।

মোটকথা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র- ছাত্রীদের যে সামাজিকীরণ ঘটে তার ফলে তারা আপন সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখে। শিক্ষা - দার্শনিক ডিউই- এর ভাষায়, "School should be life not a preparation for life, society should be interpreted to child though his daily living in the classrooms as a miniature society. Growth takes place as a child engages in purposeful activities that are genuine and useful to him. Teacher's function, as an intelligent director of those activities. He elaborates the concept of Education as a reconstrution reorganization and meaningful experience by means of creative intelligence and applied in purposeful activity."[৫]

ডিউই এর মতে স্কুল এবং জীবন সমার্থক, শুধু জীবনকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব তার নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। শ্রেনীকক্ষ তাদের কাছে একটি ক্ষুদ্রাতয়ন সমাজ। আর শিক্ষকের দায়িত্ব হল ছাত্র - ছাত্রীদের সঠিক নির্দেশ প্রদান করা। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার ধারণা প্রদান করবেন। যার মাধ্যমে ছাত্র- ছাত্রীদের সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে, যা তারা উদ্দেশ্যমূলক কর্মকান্ডে প্রয়োগ করতে পারে।

---

৪ William. m. Cave and Mark. A. Chesles, sociology. of Education, p. 4

৫ ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মতে, "Schools have a variety of tasks to perform, particularly as there are many more job opportunities open to school leaves in our advanced technological society. But school is not simply a place of training for future work : Schools also help in the development of our personal qualities, teach us how to deal with other people, and perhaps make us aware of some of the problems that need to be faced in society."[৬] অর্থাৎ বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র- ছাত্রীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা ও তার মাধ্যমে হতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে সব দেশ উন্নতি লাভ করেছে সেসব দেশে বিদ্যালয় কেবল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র নয়। বিদ্যালয় ছাত্র- ছাত্রীদের অন্তর্নিহিত মেধার বিকাশ ঘটতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয় তার ছাত্র- ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে পারে কিভাবে অপর মানুষের সাথে আচরণ শোভন হয় এবং সমাজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন সেসব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে পারে।

সে যা হোক, স্কুলে মূলত ছাত্র- ছাত্রীদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। এখানে শিক্ষাক ও ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আসলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব

সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের পর্যালোচনায় প্রথমে 'পরিবর্তন' (Change), 'বিবর্তন' (Evolution), 'উন্নয়ন' (Development) এবং 'প্রগতি' (Progress) প্রভৃতি শব্দ গুলো প্রায়ই সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যেখানে এসবের অর্থগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে, সেখানেও এগুলোকে যুক্তি -

---

৬ Jack Nobbs and etal, Sociology, P. 82

Dhaka University Institutional Repository

শৃঙ্খলার দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে অনেক পরে সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যায় এসব প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুরুতে সমাজ বিবর্তনের ধারণাটি সরাসরি জৈব- বিবর্তনের তত্ত্ব থেকে এসেছে। মূলত উনিশ শতকে এ তত্ত্বের ফলেই সমাজবিজ্ঞানের উপর ইতিহাস- দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী হাবার্ট স্পেন্সার তাঁর "সামাজিক স্থিতিবিদ্যা" ("স্যোসাল স্ট্যাটিকস্," ১৮৫০)এবং "সমাজবিজ্ঞানের নীতিমালা" ("প্রিন্সিপল্স অব সোসিওলজি," ১৮৭৬-৯৬) নামক দুটি গ্রন্থে সমাজ ও জীবদেহ এবং সামাজিক ও জৈবিক বিবর্তনের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজ বিবর্তনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে জীববিজ্ঞানের ঐ মতবাদের আরও সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য- যেমন, বিবর্তনের সংজ্ঞা হিসাবে "পরিবর্তিত রূপে বংশ পরম্পরার" কথা কিংবা ডারউইনের তত্ত্বের বিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।

সামাজিক পরিবর্তন- প্রক্রিয়ার বর্ণনায় "উন্নয়ন" শব্দটি "বিবর্তন" এর চেয়ে খুব বেশী সুনির্দিষ্ট নয়, সাধারণ অর্থে 'উন্নয়ন' বলতে বোঝায় ধারাবাহিক অগ্রগতি কোন কিছুর ক্ষুদ্র অংশের পূর্ণতর বিকাশ; বীজ এর মধ্যে যা নিহিত তার ক্রমোন্নতি"। এই অর্থেই আমরা এখানে উন্নয়ন শব্দটিকে ব্যবহার করে শিশুর বিকাশ কিংবা কোনো অসুখের প্রকোপ হ্রাস- বৃদ্ধির কথা বলি। কিন্তু আমরা কখনই নিশ্চিত রূপে একটি সামাজিক ঘটনার উৎস স্বরূপ বীজটিকে চিহ্নিত করতে কিংবা কোন একটি প্রক্রিয়ার উন্নতি ও অবনতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারি না। সম্ভবত, শুধু দুটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই পরিভাষাটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়- একটি জ্ঞানের বিকাশ বোঝাতে; অপরটি, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে; প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দক্ষতার বৃদ্ধি হার পরিচায়ক । এই দুটি প্রক্রিয়া অবশ্যই মানব সমাজের উন্নতি ও বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিককালে বহু সমাজতাত্ত্বিক লেখায় "উন্নয়ন" শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। প্রথমত, সফল শিল্পোন্নত এবং মূলত গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক, এই দুই প্রধান ধরনের সমাজের মধ্যে পার্থক্য করতে; এবং দ্বিতীয়ত; শিল্পোন্নয়ন ও আধুনকীকরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে (বার্ণস্টাইন) ১৯৭৩; আলভি ও শানিন, ১৯৮২) 'উন্নয়ন' শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বিভিন্ন ধারায় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কসীয় আলোচনার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'মহানাগরিক' কেন্দ্রের উপর তৃতীয় বিশ্বের এবং সাধারণভাবে প্রান্তস্থিত দেশগুলোর নির্ভরশীলতার আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পল ব্যারন (১৯৫৭) , গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (১৯৬৯) ও সামির আমিন (১৯৭৬) উক্ত নির্ভরশীলতা তত্ত্বের এক একজন মুখ্য প্রবক্তা। অনেক লেখক অবশ্য তত্বটির সমালোচনা করে বলেছেন, এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণী কাঠামোকে উপেক্ষা করে আন্তদেশীয় বিনিময়- সম্পর্কের উপরই শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। ফলে অন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে, যাতে 'উপনিবেশিকোত্তর' সমাজকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রাক্রিয়ার বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।[১] আসলে শিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুকাল পরেই ১৯৫১ সালের জাতি সংঘের এক সমীক্ষায় কতকগুলো নির্ঘন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ সমূহকে উন্নতগামী, উন্নতকামী , তৃতীয় বিশ্ব ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্ভরশীল তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অনুন্নত বিশ্ব দীর্ঘ দিন যাবৎ উন্নত বিশ্বের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে বর্তমান অনুন্নত অবস্থা।

---

১ টম বটোমোর, (অনুবাদঃ হিমাচল চক্রবর্তী) সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা, পৃ- ২৯৩- ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ এবং মূলধন ও পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। এ শ্রেণী সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আসলে এই শ্রেণীটি উহার নিজস্ব স্বার্থে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালিত করে এবং এভাবে এটি উন্নত বিশ্বের স্বার্থরক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালন করছে। ইহার প্রধান কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে রাউল প্রেবিস তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, " as a result of existing international division of labour and associated system of international trade, the benefits of technical progress were unevenly distributed between centre and periphery."[২]

আসলে তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ গুলো আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের আন্তর্জাতিক বেড়াজালে আবদ্ধ। তারা নিজেদের স্বার্থে সাহায্যের নামে যে অর্থ প্রদান করে তাতে করে অনুন্নত বিশ্ব দিন দিন উন্নত বিশ্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারা সব সময় অসম বাণিজ্য চুক্তিতে তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করতে চায়। তাই দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে না। এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। ফলে তৃতীয় বিশ্বে বহুবিধ সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল চাবিকাঠি হিসেবে শিক্ষা কাজ করেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ গুলোর বিপর্যস্ত

---

২ Quoted in Michael. P. Todaro, Economic development in the third world, p.28.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির কারণেই শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে, বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি। অথচ আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকদের যুক্তি হচ্ছে, "These countries are underdeveloped because most of their people are underdeveloped having had no opportunity of expand in their potential capacities in the service of society."[৩]

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের মূলকারণ হচ্ছে মাথা পিছু আয় এখানে খুবই নিম্ন। অতিনগরায়ন হওয়া ও অতিরিক্ত জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বে আশানুরূপ শিল্পায়ন হচেছ না। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী , সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়নের নির্ঘন্ট সমূহ বিশ্লষণে বিশেষত ঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে মূল বিষয়কে এড়িয়ে গেছেন। তারা মৌল কাঠামোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবলমাত্র উপরিকাঠামোকেই বিবেচনা করেছেন।

সে কারণে সামাজিক কাঠামোর একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'শিক্ষা' পরিস্থিতির বিশ্লেষণে শ্রেনী প্রত্যয়কে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে দেখা যায় শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীর অবস্থান, শিক্ষার সাথে শ্রেণীর সম্পর্ক , শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়কে অর্থনীতিবিদগণ কেবল অর্থের সাথে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা রাজনীতির সাথে এবং সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজিক কাঠামোর সাথে যুক্ত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়নের মাধমে ব্যক্তি চরিত্রের উন্নয়ন, ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এমন কি রাজনৈতিক উন্নয়ন যে সম্ভব সেদিকে তাঁরা তেমন দৃষ্টিপাত করেন নি। শিক্ষা যে একধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের মনে কোন সন্দেহ নেই। উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেহেতু শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া সেহেতু তার মাধ্যমে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের সমাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনের রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হল।

---

৩ British Journal of sociology of Education. Vol. 2, p. 300

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ঃ শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক উপযোজন ঘটে। আর সামাজিক উপযোজন সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। সামাজিক পরিবর্তনের কতগুলো পর্যায় রয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ব্যক্তিদের সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় নেতা বলা হয়ে থাকে। এরা সাধারণত সামাজিক অসংগতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং এর পরিবর্তনের আহবান জানান। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজের আরো সদস্য ঐ ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে নিজেদের একটি মতাদর্শ গড়ে তুলেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে মতামত সংগঠিত করেন। এমনিভাবে একটি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যখন সামাজিক উপযোজন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। আর কেবলমাত্র প্রকৃত প্রশিক্ষনের মাধ্যমেই উন্নত চরিত্রের নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে। আর ঐ নেতৃত্বই সামাজিক উন্নয়ন কিংবা পরিবর্তনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। তাহলে বলা যায়, শিক্ষা সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তব পটভূমি প্রস্তুত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত অথচ ঐতিহ্যবাহী সমাজের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। সামাজিক জীবের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমাজের উপযোগী মতাদর্শ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকে। যেমন, পরিবার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সাম্প্রতিক কালে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের মধ্যে সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সমাজের মধ্যে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তুলছে। এসব সংগঠন এখন মানুষের আচরণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানে সমাজ জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব সংগঠনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। মোটকথা হচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। আর এই কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যক্তি জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষা পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এ কারণে সমাজের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে নতুন মূল্যবোধ স্থায়িত্ব লাভ করে।

চতুর্থত ঃ শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বৃদ্ধি করে। আর সমাজের চাহিদার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে মানুষ এখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার চাহিদা থেকে সমাজের ভেতর মানবিক সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে।

পঞ্চমত ঃ শিক্ষায় আলোকিত হলে মানুষের অভিযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে অভিযোজনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর ফলে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে সার্থকভাবে খাপখাইয়ে নিতে পারে।

সুতরাং দেখা যায়, সামাজিক বিশ্বাস ও মুল্যবোধের পরিবর্তন সামাজিক আদর্শ গঠন সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ইত্যাদি সকল কর্মই শিক্ষার দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে। তাই সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এই কারণে ১৯৬৪-৬৫ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন তাদের প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন, "The most important and urgent reform needed in education is to transform it to endeavour to relate it to life, needs and aspirations of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic, and realization of the national goals."[৪] উপরের আলোচনা থেকে আমরা এখন বলতে পারি যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান

---

৪ উদ্ধৃত ঃ সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, পৃ- ৯৮

উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। তবে এখানে এটাও বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষা সরাসরিভাবে সামাজিক পরিবর্তনের সহায়তা করতে পারে না। ব্যক্তিই শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে । অর্থাৎ শিক্ষা, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আনে। ব্যক্তির জীবনে উন্নতির ফলে সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। তাই ব্যক্তি জীবনের উন্নতি এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তাই "The greatest need of the therefore is the healing power of education. Education alone can free our minds from the bondage of ignorance and superstition, secure us against the threats of barbarism and savagery, enlarge the horizons of our minds, emancipate our imagination and realize our imprisoned energics."[৭]

আসলে পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্র নায়কদের প্রধান দায়িত্ব হবে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো। শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ, কুসংস্কার, পশ্চাৎমুখিতা থেকে উন্নততর সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া উন্নয়ন মূলক সমাজ বিজ্ঞানে উন্নয়নের প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয়েছে। আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকেরা পাশ্চাত্য দেশ সমূহের উন্নয়নের পেছনে শিক্ষার দ্রুত প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধিকে অন্যতম কারণ বলে দায়ী করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জাপান ও কোরিয়ার কথা। এই দু'টি দেশ কিছু কাল পূর্বে ও দরিদ্র দেশগুলোর তালিকায় ছিল। শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ভূমিকা ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমেই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তারা সমাজ বিকাশের নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ও তা সম্ভব, যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হন।

---

৭ Week, (ed) Abdullah Al- muti Sharfudin, The star press, Dhaka, (1968) pp.9-10

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সামাজিক শ্রেণীভুক্ত সকলের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য । কারণ শিক্ষা ব্যতীত একটি উন্নত জাতি ও আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অকল্পনীয় ব্যাপার। পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্য শিক্ষা আজ অন্যতম পূর্ব শর্ত হিসেবে পরিগণিত। এই প্রসঙ্গে হারবিসন ও মায়ারর্স এর শিক্ষা সম্পর্কিত একটি উক্তি এখানে বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। তাঁদের ভাষায়, " Education is the key that unlocks the door to modernization".[১]

ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রধান ও কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা । শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক দুইভাবেই হতে পারে। পরিবার হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূলভিত্তি। পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, শ্রেণীগত অবস্থান প্রভৃতির উপর শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভরশীল। মোটকথা, শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক মর্যাদা তার পরিবারের আর্থ- সামাজিক এবং সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত চার ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস সনাক্ত করেছেন। যেমন, Slavery, Estates, castle and social class and status group. তাই আমরা দেখতে পাই প্রতিটি স্তরবিন্যাস বিশেষ সমাজে শিক্ষা এবং একটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে। টি. বি, বটোমোর যথার্থই বলেছেন যে,"Wherever there is a system of social stratification, there is a corresponding differentiation within the Educational system."[২] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কার্ল মার্কস মূলত পুজিবাদী সমাজ বিশ্লেষণে 'social class' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন, যাকে ওয়েবার শিক্ষা, পেশাও সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে এক একটি মর্যাদা গোষ্ঠী চিহ্নিত

---

১ উদ্ধৃত ঃ সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, পৃ- ৬৭

২ T.B. Bottomore, Sociology, P. 264.

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ওয়েবার মর্যাদা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে জীবন পদ্ধতি (life style) এবং জীবন সম্ভাবনা (life chances) এর কথা উল্লেখ করেছেন।

ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট জীবন প্রণালী রয়েছে। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন প্রণালীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে, চাল- চলন, রীতি- নীতি, পেশা, শিক্ষা, ক্ষমতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা আরো মনে করেন যে, বিভিন্ন ধরনের পেশার সাথে শিক্ষার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই শ্রেণীকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা শিক্ষা ও পেশার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কারণ বিভিন্ন পেশার লোকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিন্ন নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন কেরানীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং একজন অধ্যাপকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এক হতে পারে না। অন্যদিকে আয়ের দিক থেকেও দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

প্রাচীন ভরতীয় সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সেখানে কর্ম বিভাজনের উপর ভিত্তি করে চারটি প্রধান জাতি- বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ

১। ব্রাহ্মণ -- যাজক শ্রেণী (কর্ম ঃযজন, যাজন, অধ্যাপনা ইত্যাদি)

২। ক্ষত্রিয় -- যোদ্ধা শ্রেণী (কর্ম ঃ প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ইত্যাদি)

৩। বৈশ্য -- ব্যবসায়ী শ্রেণী (কর্ম ঃ ব্যবসা - বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি)

৪। শূদ্র -- দাস শ্রেণী (কর্ম ঃ উপরে উল্লিখিত তিন জাতিবর্ণ ভুক্ত লোকদের সর্বদা সেবা করা)।

মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজে স্তর বিনাসের মৌলিক কোন পরিবর্তন না হলেও উক্ত জাতি- বর্ণের লোকেরা তাদের মর্যাদা বজায় রাখা ও পেশার স্বার্থে রাজ দরবারের ভাষা পার্সী শিখে। অবিভক্ত বাংলায় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে রাজা রাম মোহনের পরিবার।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে, ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে প্রথম দিকে বৃটিশরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী না হলেও পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনেই তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে ইহার পেছনে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৮৩৫ সালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে মেকলে যে মন্তব্য করেন তাতে শাসক ও শাসিতের ভেতর একটি মধ্যবর্তী শ্রেণী সৃজনের ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। মেকলে বলেছিলেন, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millians whom we govern, a classs of persons. Indian's in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. "[৩]

তাই ভারতে বৃটিশ শাসক বর্গ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভেতর মধ্যস্থতাকারী একটি ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চালর্স উড ১৮৫৪ সালের ১৯ শে জুলাই তারিখে যে, " এডুকেশন্যাল ডেসপ্যাচ" প্রনয়ণ করেন তারই সুপারিশক্রমে ভারতের তাৎকালীন তিনটি প্রেসিডেন্সী শহর কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে সিপাহী বিদ্রোহের বৎসরই বিলাতের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, বৃটিশ শাসক বর্গের স্বার্থে কাজ করবে এমন একটি বিশেষ বিদ্বান শ্রেণী সৃষ্টি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । এবার আমরা বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই যে, এখানেও বিভিন্ন পেশার লোক দেখা যায়, যাদের পেশার সাথে শিক্ষারও ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় যে, পেশার সাথে আয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। একজন কৃষকের যে আয় একজন ব্যবসায়ীর সেই আয় নয়। তাই দেখা যায় যে, কৃষকের ছেলেমেয়ে দিন দিন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিম্নের ছকটি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

---

৩ G. M. Young, Speeches by Lord Macaulay with his minute of Indian Education, London, P. 359

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ২.১

বাংলাদেশে পেশার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

↓

পেশা	স্কুলে যায়	স্কুল ত্যাগ করেছে	কখনো স্কুলে যায়নি
দিন মজুর	১৩.৭৯	২.৯৭	৮৩.২১
কৃষি জীবী	৪২.৯৯	২.০৩	৫৪.৯৫
ব্যবসায়ী	৪৩.০৪	১.৯৩	৫৪.৬৬
চাকুরীজীবী	৪১.৪৫	২.২৯	৫৬.২৬

উৎসঃ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৬

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যমান। সংস্কৃতির ভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণর নানা প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। সুতরাং সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণের ভিন্নতার কারণে শিশুর প্রতিভার বিকাশও তারতম্য ঘটে। পরিবেশ ও শিশুর প্রতিভা বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, উপযুক্ত পরিবেশ তথা ভাল স্কুলের অভাবে শিশুর সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটে না।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্রিক গবেষণা শুরু হয়। কল্যাণকর রাষ্ট্র স্থাপন তথা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা এবং শ্রেণীর বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর সকলের জন্য শিক্ষার যে প্রয়োজন তা ক্রমেই বিভিন্ন দেশে সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করছে। শিক্ষা সম অধিকারের প্রশ্নটিও সকলের মধ্যে উত্থাপিত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড ব্লেসিম বলেন, "Children should have equal opportunity to demonstrate their intelligence, aptitudes,

Dhaka University Institutional Repository

potentialities so that they enjoy the most appropriate educational provisions."[৪]

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কারণ সমাজে বিদ্যমান নানা বৈষম্যের কারণে শিক্ষার সুযোগ সকলে সমান ভাবে পাচ্ছে না আসলে এটা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণী , বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত লোকের পেশা, আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জীবন ধারা অভিন্ন নয়। যেমন, একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ীর জীবনধারা, চাল- চলন, বংশ মর্যাদা, ক্ষমতা, আয় একজন শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ব্যবসায়ীর ছেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। শ্রমিকের ছেলে সে সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত । ফলে তারা ক্রমাগত সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমান কালে সমাজে যে স্তরবিন্যাস এবং মর্যাদা ও ক্ষমতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা মূলত পূর্বেকার সমাজের মানুষের মধ্যকার জটিল চিত্রকেই প্রতিফলিত করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়,"Class differences in Educational opportunity are just not a matter of unequal economic resources. It is not only some have the money to pay of private education whilist other do not."[৫] ফলে যখনই শিক্ষার সমান সুযোগের বিষয়টি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় এবং তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তথা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এবং আর্থিক অনুদান দিয়ে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা হয় তখনই শ্রেণীগত বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

---

৪ Edward Bleshim, Blonds Encyclopaedia of Education, p. 700.

৫ ibid.

আমরা যখন আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে, সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা জীবন গড়ার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পাচেছ, যার সামান্যতম পরিমাণ ও শ্রমিক বা দিন মজুরের ছেলে পাচ্ছে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ, গৃহশিক্ষক ইত্যাদি পাচ্ছে, যা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা পায় না , এর ফলে সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মাতাপিতা শিক্ষা সম্পর্কে সর্বদা স্পষ্ট ধারণা রাখেন। তারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেই অনুসারে সন্তানদের পড়ে তুলেন। পক্ষান্তরে, নিম্নবিত্ত পরিবারের মাতা পিতা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিশুদের পড়া লেখার প্রতি উদাসীনতার ভাব প্রদর্শন করেন। তারা শিশুদের কে স্কুলে না পাঠিয়ে শিশু শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট থাকেন। তাই বলা যায়, " Social class, there fore, a very telling factor in the allocation of educational opportunity. It remains a powerful determinant because the more privileged classes can still be considered superior to that provided by the state and because of many qualitative differences in class background make for inequalities even with in the public system of education. Whose organizational and financial structure seeks to embody and equality of provision according to equality of opportunity."[৯]

সামাজিক শ্রেণীর মাঝে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজমান তার জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজ কাঠামোই দায়ী। বিদ্যমান সমাজকামোর পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে গোটা সমাজের পরিবর্তন। অর্থাৎ মার্কসীয় ধারণায় সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন।

---

৯ Bleshim, opcit, p.700.

Dhaka University Institutional Repository

এখন আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের অধিক অগ্রসরতার কারণ এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝড়ে পড়ার কারণ গুলো নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

জ্যাক নবস্ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয় গুলোকে দায়ী করেছেন ঃ

1. Greater parental concern with education.
2. Books and speech at home designed to help a child's vocabulary.
3. Middle class speech patterns and norms of behaviour in school.
4. more opportunity for travel and stimulation through educational visits.
5. The different gratification of study now and get a better job later.
6. Higher levels of parental expectation.
7. Home work facilities.
8. Private Tutor.[৭]

এবার আমরা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝড়ে পড়ার কারণ গুলো কি তা দেখার প্রয়াস পাব। মোহাম্মদ সিরাজুল হক তাঁর "Drop out in primary school" শীর্ষক অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভে শিশুদের স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার কারণ গুলো তুলে ধরেছেন। যা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

1. Domestic and other works.

---

৭ Jack Nobbs and etal, sociology, p. 82

2. Parental Neglect
3. Poverty
4. Failure of school
5. Lack of interest in Schools.
6. The plea of having grown up (in the case of girls), early marriage, admission to madrasha, and lack of transportation, and suffered grade retardation.[৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত অন্য একটি গবেষণায় (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ) প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝড়ে পড়া অথবা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে না পারার কারণ গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ

ক) স্কুলের বেতন পরিশোধ করতে না পারা

খ) বই কেনার জন্য অর্থের অভাব

গ) পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা

ঘ) পরিবহন বা যাতায়াত সমস্যা

ঙ) আর্থ- সামাজিক এবং অন্যান্য কারণ[৯]

ডেনিস লাউটন নামক একজন বৃটিশ লেখক তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থে বলেন ঃ "For both the question of early leaving and the question of poor performance the school

---

৮ Md. Sherazul Haq, Dropout in Primary School, Dhaka, Institute of Education and Research, university of Dhaka, 1961, Unpublished Dissertation.

৯ Sayed Abdur Rahman, The Extent and cause of dropout in Secondary schools of Dhaka, 1965, IER, D.U.

Dhaka University Institutional Repository

may bear a responsibility as well as the pupil's home background."[১০] এছাড়া লাউটন অল্প বয়সে শিশুদের স্কুল ছাড়ার পিছনে নিম্নলিখিত কারণ গুলোর কথা উল্লেখ করেনঃ

1. Physical condition of the home.
2. Income of the parents.
3. parent's attitude to education.
4. The power of the school to assimilate working class pupils.
5. Size of family.[১১]

সুতরাং দেখা যায় যে, আদর্শগত দিক থেকে শিক্ষা মূলত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংযোগকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার বিপরীতটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আসলে সব সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম বেশী শ্রেণী পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটছে। সতিকথা বলতে কি কার্যক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত মন মানসিকতা গড়ে তোলার অর্থ শ্রেণীগত আদর্শ বা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা প্রবর্তন করা। অতএব একথা বলা যায় যে, মানব সমাজের প্রাচীন কাল থেকে বর্তমন কাল পর্যন্ত সকল সমাজেই সামাজিক শ্রেণীর সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নানা ভাবে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে আজ যারা উচ্চবিত্ত তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে উন্নত মানের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। যেমনঃ- গ্রামার স্কুল , কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট স্কুল ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, নিম্নবিত্তের সন্তানেরা শিক্ষার সামান্য সুযোগ ও পাচ্ছে না। রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।

---

[১০] Denis Lawton, Social class, Language and Education, p. 4

[১১] ibid, p. 6.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ

৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঃ বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক , অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিক্রমায় শিক্ষা ও ক্রমশ একটি শ্রেণীগত বৈষম্যের ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। শিক্ষার ক্রমবিকাশের এই ধারাকে অনুসরণ করেই মানুষ তার সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ইউরোপ। তবে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে চার হাজার বৎসর পূর্ব চীন দেশের সানসি প্রদেশে লিখিত ভাষার আবিষ্কার, খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে ইরাকে নগরবাসীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজেদের বাড়ীতে বিদ্যালয় স্থাপন, প্রাথমিকভাবে পণ্য কেনা বেচার হিসাব নিকেশে শিক্ষা, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ধর্মযাজকদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং তারই ধারাবাহিকতায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে প্রাচীন গ্রীস ও এথেন্সে শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি। আর এই পটভূমির অন্তর্নিহিত সত্যটি হচ্ছে শিক্ষায় শ্রেণীগত বৈষম্যের প্রবাহমান ধারা। যা ইতিহাস বিশ্লেষণে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। দার্শনিক এরিষ্টল, প্লেটো, রুশো এবং লক্ প্রমুখের শিক্ষা বিষয়ক ধারণার মধ্যদিয়ে শিক্ষা বৎসর এই শ্রেণীগত বৈষম্যের চিত্রটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে হয় যেন শুরুতেই শিক্ষা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সুযোগের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী তাদের স্ব স্ব মর্যাদার স্তরায়নের ভিত্তিতেই শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যায় ক্রমিক সুযোগ গ্রহণ করছে।

ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় যে, রোমের অভিজাত শ্রেণী তাদের সন্তানদের জন্য শৈশবে আইনের মৌল বিষয়গুলো শিক্ষা, সাম্রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং প্রশাসনিক শিক্ষা দাসের জন্যই প্রবর্তন করে শিক্ষা ব্যবস্থা, তাই বিশাল রোমান সাম্রিধ্যে লেখাপড়া সাধারণত উচ্চবিত্ত ও

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল এবং, ধর্ম ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় "গ্রামার স্কুল" স্থাপন করে সেখানে শাসক, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ীও সামরিক কর্মকর্তাদের সন্তানদের উচ্চমানের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মুখ্যতঃ ধর্মযাজকদের নিয়ন্ত্রাধীন। পুরোহিত্যেরজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। সিটি করপোরেশন এলাকায় বার্গারদের সন্তানদের জন্য সাধারণ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।[১]

এপ্রসঙ্গে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানে সমান অভিজ্ঞ বটোমোর বলেন, These were maintained by the existence of different types of schools for the various social groups, such as the English 'public school's reserved for children of the upper class, or by the unequal distribution of opportunities for higher education. Higher education in most western countries traditionally involved the languages and culture of classical Greece and Rome, and this reinforced the distinction between the educated gentle man and the rest of society"[২]

যদিও রেঁসেনার যুগে যুক্তি ও মুক্ত চিন্তার প্রভাবে ইউরোপে রাজা, চার্চ ও ভূ- স্বামীদের সঙ্গে স্বৈরশাসক ও অভিজাতদের দাপট কমতে শুরু করে এবং সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠতে থকে। নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে উঠে সমগ্র ইউরোপ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যুক্তির আকাঙ্খা বিকশিত হতে থাকে। তথাপি ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সাধারণ কৃষক শ্রমিকদের জীবনে শিক্ষার আলো

---

১ আব্দুল খালেক, শিক্ষা চেতনার মূল উৎস, দৈনিক সংবাদ, মার্চ ১৯৮৮, পৃঃ ৪

২ T. B. Bottomore, Sociology, p,. 265

পড়ুক এটা অভিজাত মহল শাসক শ্রেণী কামনা করেনি কখনো। তখনকার দিনে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যেতো না বা যেতে পারতো না তাই বাধ্য হয়ে মাঠে কিংবা কারখানায় কাজ করতো । শ্রমিক ও কৃষকের ছেলেমেয়েরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে সচেতন নাগরিক হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য অভিজাত শাসক বর্গ নানাভাবে তাদের শিক্ষার বিরোধিতা করতো, তাদের কে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতো। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং উৎপাদক শ্রেণী, শাসক, অভিজাত, যোদ্ধা প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য শুধু উৎপাদন করে যাবে এ দৃষ্টি ভঙ্গীতে এরই প্রমাণ মেলে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ১৭০৯ - ১৮৩৫ সাল

১৭০৯ সালে কলকাতায় পাদ্রী রেভাঃ ব্রেয়ার ক্লিক কর্তৃক ইউরোপীয় স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ, "১৭২০- ১৭৩১" এই কাল পর্বে রেভাঃ বেলামীকর্তৃক দাতব্য স্কুল স্থাপন এবং পরবর্তীতে ১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভের আমন্ত্রণে মাদ্রাজ থেকে আগত বিখ্যাত মিশনারী কিয়ের মানভার কর্তৃক কলকাতায় ৪৮ জন ছাত্র নিয়ে স্কুল গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই ভরতবর্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে, পরবর্তীতে ১৭৮৯ সালের ২১ শে ডিসেম্বর গভর্ণর জেনারেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় Free School Society of Bengal গঠিত হয় এবং কিয়ের মানভারের স্কুলটিকে এর সাথে যুক্ত করা হয়। যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ব্যাপকভাবে দাতব্য স্কুল প্রতিষ্ঠা। কোম্পানী পরিচালিত স্কুলের পাশাপাশি মিশনারী পরিচালিত এই সমস্ত স্কুল গুলো ভারতের শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শাসক ও শাসিতের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও এই সমস্ত মিশনারী স্কুলগুলোর ভূমিকা রয়েছে।[৩] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এর আগ পর্যন্ত ভরতবর্ষে শিক্ষা শুধুমাত্র কোম্পানীর ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও ধর্মীয় প্রচারনার উদ্দেশ্যই পরিচালিত হয়েছিল।

---

৩ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা, পৃঃ ৯-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর উপর এদেশীয় শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হলে কোম্পানী এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ দমন করে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে এদেশীয় একটি সহযোগী শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। তারা এই বিশেষ শ্রেণীকে ইউরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা ও বোধ করে। সেই লক্ষ্যে প্রণয়ন করে শিক্ষানীতি। মিশনারীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে এদেশবাসীর যে প্রতিক্রিয়া সে দিক লক্ষ্য রেখে তারা শুধুমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, কোম্পনী এ সময় মিশনারীদের সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার কথাও ভাবতে থাকে। তারা প্রাচ্য নীতির প্রবক্তাদের ধারণা অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে এবং সংস্কৃতি ও আরবী উভয় ভাষায় শিক্ষার নীতি গ্রহণ করে। বিলাতের "কোর্ট অব ডাইরেক্টরস" আগ্রহের সাথে এ নীতি অনুমোদন করে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর লোকদের খুশী করার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়। যাকে বলা হয়, Orient School of Education policy.

১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিং কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্যদিয়ে এর প্রতিফলন ঘটে। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানী এ নীতি অনুসরণ করে চলে এবং বেশীর ভাগ অর্থ কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের জন্য ব্যয় করে। অবশ্য এ নীতি গ্রহণ করার পর থেকে মিশনারী তৎপরতা ক্রমশই সরকারী সহানুভূতি হারাতে থাকে। শুধু তাই নয়, সরকার এদের বিরুদ্ধে দমনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। অন্যদিকে মিশনারীরা এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে খোদ ইংল্যান্ডে আন্দোলন শুরুকরে এবং ধর্মপ্রচারের পক্ষে আইন- প্রণয়নের লক্ষ্যে পার্লামেন্টের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যনীতির প্রবক্তারা সজাগ ছিলেন। এদের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন, ভরতবর্ষের আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জনক চালর্স গ্রান্ট। ভারত বাসীর শিক্ষা সম্পর্কে চার্লস গ্রান্টের ১৭৯২ সালের ঐতিহাসিক দলিল, "Observation on the state of society among the Asiatic subject of Great Britain, particularly with respect to morals; and the means of improving it."

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৭ সালে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রান্টের এই দলিলকে কেন্দ্র করেই মূলত ইংল্যান্ডে আন্দোলন গড়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে ১৮১৩ সালে এক চার্টারে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা গৃহীত হয়। গ্রান্ট তাঁর প্রতিবেদনে ভারতবাসীর মনের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর করার জন্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভ করা দরকার বলে মনে করেন এবং দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য যান্ত্রিক যুগের আবিষ্কার গুলোর সাথে দেশবাসীর পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

ইংরেজী ভাষা ও পশ্চিমের জ্ঞান- বিজ্ঞান শেখলে ভারতবাসী রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ ডেকে আনবে . . . এই যুক্তিতে ভারতবাসীকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখা ঠিক বলে যারা মনে করেন, গ্রান্ট তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ঠভাবে বলেন; "ভারত বাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইংল্যান্ডের এক নম্বর দায়িত্ব, ইংল্যান্ডের স্বার্থেই ভারতবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা উচিৎ। কেননা, " Such education would bring about better understanding between the rulers and the ruled would secure the gratitude of Indian people and would ultimately lead to greater extension of British commerce in India."[৪]

এমনিভাবে ১৮১৩ সালের এই নতুন সনদ হয়ে দাঁড়ালো ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন পদক্ষেপ। রূপে ১৮১৩ সালের সনদ গৃহীত হবার পর ১৮২৩ সালে গঠিত হয় 'জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইন্সট্রাকশন' যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার অবশ্য এ সময় কালে তথা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি , ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল সোসাইটি ১৮২২ সালে রাজা রামমোহনের এ্যাংলোহিন্দু স্কুল- সব কিছুরই মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রসার।

---

৪ Syed Nurullah and J. P. Naiks, A student History of education in India. P. 43

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে জেনারেল কমিটি দীর্ঘকাল কাজ করে যায়। ১৮৩৪ সালের ১৪ জুন লর্ড মেকলের এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাঃ ১৮৩৫-১৯৪৭ সাল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ঐ সময় রেনেসার প্রভাবে বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন সংঘটিত হয়। যার ফলে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক ধারণায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রসঙ্গে অর্পনা বসু বলেন, The decision to introduce English education in India was a mementous step taken by the British raj and the year 1835. can be regarded as an important landmark in modern Indian history.[৫]

অবশ্য ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে প্রথমদিকে বৃটিশরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করলেও পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনেই তাদের নীতির পরিবর্তন করে। শুধু তাই নয় তারা তাদের নিজেরদের প্রয়োজনেই শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে এর পেছনে নানা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল, যা ১৮৩৫ সালে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রারম্ভে মেকলের একটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। মেকলে বলেছিলেন, We must at present do our best to form a class who may be interpreter between us and millions whom we

---

৫ Aparna Basu, The Growth of Education and political Development in India 1898-1920, p. 1

Dhaka University Institutional Repository

govern, a class of persons, Indians in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."[৬]

অবশেষে ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ উইলিয়াম বেন্টিংক এক আদেশ বলে মেকলের শিক্ষানীতি গ্রহণ করে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এ লক্ষ্য থেকেই তারা গড়ে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়। একটি বিশেষ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করাইছিল তাদের উদ্দেশ্য । এটা শুধুমাত্র ডিগ্রীর ছাপ দিয়ে তাদের সহযোগী বানানো ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাই সমাজবিজ্ঞানী গুনার মিরডাল বলেন "The whole system was determined by the fact that degree were the pass port to government service"[৭] মেকলের এই শিক্ষানীতিতে ইংরেজ সরকারের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়েছে। সে জন্য ভারতের গভর্ণর জেনারেল মেকলের সুপারিশমালা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, "The great object of the British government ought to be the promotion of European literature and seiencl among the natives of India; and that all the funds apprpriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."[৮]

যে যা হোক বৃটিশ প্রবর্তিত উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও পড়েছে। শাসক নানা স্তর তথা বিভিন্ন শ্রেণী এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে বৃটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকে ধারণ করেই আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরের চেয়ে উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্ব

---

৬ G.M. Young, Speeches by B.T. Maccully with his minute of Indian Education, Londan, 1835, P. 359.

৭ Gunnar Myrdal, Asian Drama , Vol. 3 p. 1941

৮ Syed Nurullah and J. P. Naiks, A student History of Education in India, p. 61.

Dhaka University Institutional Repository

আরোপের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ শিক্ষার উচ্চ স্তরে সমাজের নিম্নশ্রেণীর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায় সমাজের ২৫% সৌভাগ্যবান উচ্চবিত্ত বা বিত্তবান শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা। সেজন্য টম বটোমোর বলেন, " The educational system tended to maintain and even increase the gulf between the upper classes and the mass of the population, and to make this separation more complete by transforming it into one of language and general culture."[৯]

মোট কথা, একটি বিষেশ শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি বরং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার কোন আদর্শ যথা যুক্তবাদ ও বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ কোন কিছুই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও নীতি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।[১০] শুধু তাই নয়, যে জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর মাঝে এই শিক্ষার প্রসার তারা করতে চেয়েছিল, তারই এই শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। ফলে বৃটিশরা যখন প্রথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলো, তখন এই শ্রেণীটিই প্রথম বাঁধ সাধলো। রিস তাঁর রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে বলেন, "জমিদার শ্রেণীর আপত্তির মূল যুক্তি ছিল ঃ (১) চাষীর ছেলের রোদ বৃষ্টি সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে, (২) ঐ ছেলে পিতার কাজকে অর্থাৎ চাষের কাজকে ঘৃণা করতে শিখবে, (৩) চাকর -বাকর নষ্ট হয়ে যাবে (৪) চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশী উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করবে।"[১১]

---

৯ T. B. Bottomore, opcit, p. 264.

১০ বিনয়ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃঃ ৪৯

১১ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শিক্ষা ও শ্রেণী, সংস্কৃতি প্রকাশ, ঢাকা- পৃঃ ২৩- ২৪

Dhaka University Institutional Repository

যদি কৃষকের ছেলেরা পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে শুরু করে তাহলে তারা নীতিহীন প্রচারকের প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক দিদারের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যে কৃষক পড়তে পারে, তাকে ঠকানো যে কোন অন্য ব্যক্তিকে ঠকানো অপেক্ষা কঠিন" দিদারের মতো ব্লিসেরও মত হচ্ছে "কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাকে ঠকানো যাবে না, বোধ হয় একারণেই জমিদার শ্রেণী আপত্তি তুলেছিল, " It is not necessary to acccentuate the intelligence of the rural people."[১২]

মানব সমাজের দীর্ঘ কয়েক হাজার বছরের পরিক্রমায় বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা যেমন, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, ও পুঁজিবাদী সমাজে আর্থ- সামাজিক বাস্তবতার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীগত তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। তবে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যতীত এর পূর্ববর্তী সমাজ সমূহে শিক্ষা ছিল কঠোর ভাবে বিশেষ শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের উদ্ভবের সাথে সাথে তথা শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এবং রেঁনেসা পুনর্গঠন ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের প্রবেশ অনুমোদন লাভ করে। তবে এক্ষেত্রেও শিক্ষার সুযোগের তারতম্য ঘটলো- অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তারতম্যের কারণে।

উল্লেখ্য, ভারতে বৃটিশ সরকার লর্ড বেন্টিংক এর নির্দেশে দেশীয় শিক্ষা - ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী জরিপ পরিচালনা করেন মিশনারী ও সাংবাদিক উইলিয়াম এ্যাডাম। ১৮৩৮ সালের মধ্যেই তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করেন। এর ভেতর অন্যতম দুটো সুপারিশ হচ্ছে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির ভিত্তিতে আধুনিক শিক্ষা- ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু বৃটিশ সরকার তার এই সুপারিশ গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, ১৮৪২ সালে " জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন" এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে তার স্থলে গঠন করা হয় "কাউন্সিল অব এডুকেশন"।

---

১২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩ - ২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাই লক্ষ্য করা যায়, ১৮০৭ সালের ইংল্যান্ডে রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবের আপত্তি জানিয়ে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, লেখাপড়া শিখে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এবং এর ফলে মালিক শ্রেণী বেকায়দায় পড়বে। ঠিক একইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকোতে শাসক শ্রেণী মনে করে যে, মেক্সিকোর উপজাতীয়দের লেখাপড়া শিখালে সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করা হবে। কাজেই তাদেরকে অশিক্ষিত রাখাই উচিত। ১৮৫০ সালে মাদ্রিদে ও একটি স্কুল স্থাপনের অনুমতি না দিয়ে সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, "এখানে আমরাচিন্তাশীল লোক চাই না, আমরা চাই কাজ করার বলদ।"[১৩] এক্ষেত্রে আবার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছিল জার্মানিতে। সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষানীতি প্রবর্তন উপলক্ষে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিট দ্য গ্রেট এক ফরমানে ঘোষণা করেন যে, ৫ থেকে ১৩ বছরের সকলকে দিনে কমপক্ষে৬ ঘন্টা পড়া লেখা করতে হবে। এতদ্সত্বেও অভিজাতবর্গই উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্থান দখল করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশে প্রথম থেকেই বৈষম্যের বীজ বপন করা হয়েছে। অভিজাত শাসক ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাই দেখা যায়, ১৯৭০ সালে ইংল্যান্ডে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হলেও পাবলিক স্কুল গুলো ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অধিকাংশ পরিবারের সন্তানদের পক্ষেই সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তারা বড় জোর দ্বিতীয় মানের শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। আর অন্যদিকে উচ্চবিত্তরা যারা সমাজের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ তাদের সন্তানরাই এ সকল ব্যয় বহুল বিদ্যালয়ে,পড়াশুনা করেছে। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বৃটিশ জেনারেলদের শতকরা ৮৭ জন, বিশপদের শতকরা ৮৩ জন, বিচারকদের শতকরা ৮৫ জন, ফরেন সার্ভিসের শতকরা ৯৫ জন, এবং পদস্থ সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৬৭ জন ব্যয় বহুল পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। শ্রমিক কর্মচারীও অন্যান্য নিম্নবিত্তের সন্তানেরা

---

১৩ আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিক স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংগে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। কেননা তাদের কে শুরু থেকেই নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডে Act of 1944 এর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল শ্রেণী বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে বটোমোর উল্লেখ করেন যে "England before 1944, the educational system can be broadly characterized as having provided elementary education for working class children, secondary education for middle class children and public school education for children of the upper and upper middle class."[১৪] এসকল উল্লেখ যে, ইংল্যান্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের প্রক্রিয়াকে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসকবর্গ ভারত বর্ষেও প্রবর্তনের প্রয়াস চালিয়েছিল। এর ফলে ভারতের অভিজাত শ্রেণী তাদের সন্তানদের বিলাতী কায়দায় পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া শিখানোর মানসিকতায় মেতে উঠে। অনেকে সন্তানদের বিলেতে রেখে পড়ালেখা শিখিয়েছেন। তাই দেখা যায়, ১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসক-শোষক শ্রেণী শিক্ষা কে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেনি। তবে ঐ সালেই কতক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে "কলকাতা মাদ্রাসা" এবং পরবর্তীতে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। একথা বলা বাহুল্য যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ছিল ধর্ম ভিত্তিক। এর আগে মূলত খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে মিশনারী কর্তৃক সামাজিক প্রকল্প হিসেবে এসব স্কুল পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত গুরুগৃহ, মক্তব, টোল, ইত্যাদিও ছিল। এসবের বেশীর ভাগ ছিল শহর ভিত্তিক এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং দেখা যায় যে, বৃটিশ আমলের শুরু থেকেই শিক্ষা বৈষম্যের ধারায় পরিচালিত হতে থাকে। বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, একই সম্প্রদায়, একই গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় একই সম্প্রদায়, একই গোষ্ঠি কিংবা একই

---

১৪ T. B. Bottomore, opcit, p. 265

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভেতরও বিদ্যমান থাকে শ্রেণী বৈষম্য। এ প্রসঙ্গে একজন পথিকৃৎ সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষার সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুর্খীম বলেন, "Education varies from one caste to another, that of patricians was not that of the plebians, that of the Brahman was not that of the sudra, similarly in the middle age, what a difference between the culture that of the young page received; instructed in all the arts of chivalry, and that of villain, who learned in his paris school a smallering of arithmatic song and grammar."[১৫]

শিক্ষার ব্যাপারে কেবল গোষ্ঠী, জাতি - বর্ণ ইত্যাদির ভেতরই বৈষম্য রয়েছে তা নয়। অঞ্চল ভেদেও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ডুর্খীমের ভাষায়, "That of the city is not that of the country, that of the middle class is not that of the workers."[১৬] সত্যিকথা বলতে কি, সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মায়। একমাত্র শিক্ষাই মানুষের মাঝে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক লালন- পালন পদ্ধতি ও সযত্ন পরিচর্যায় পার্থক্য ও শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের জন্ম দেয়। এ বিষয়ে বটোমোর বলেন, " The function of education is preparing the child for a particular milieu in society .... has traditionally meant preparing him for membership of a particular group in the social hierarchy"[১৭]

সমাজবিজ্ঞানী উরসুলী ও তাঁর সহযোগী লেখকরা ইংল্যান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় শ্রেণীগত পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "The separation of children into difference types of school from an early age seems a close reflection of stratification

---

১৫ Emile Durkheim, Education and sociology, pp. 67-68

১৬ ibid, P. 68

১৭ T.B. Bottmore, Opcit, P. 266

Dhaka University Institutional Repository

where each class maintains its own habit, styles of life and rarely interacts with others."[১৮] অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যারা উচ্চ শ্রেণী তাদের ছেলে মেয়েরাই উচ্চতর মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে চাকুরীতে নিযুক্ত হচ্ছে। এলেন পোটার ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, পিতার বিত্তের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার সুযোগ নির্ধারিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মাত্র $\frac{১}{৬৩}$ ভাগ হচ্ছে শ্রমিক পরিবারভুক্ত। বাকী সবাই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। শুধু ইংল্যান্ডের নয়, একটা সময় পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো নগরীতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যায়নরত ছাত্র- ছাত্রীদের $\frac{১}{৩}$ অংশ ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ ছিল সমাজের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[১৯] অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফলন বৃটিশ প্রবর্তিত ভারত বর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও ঘটে। পিরামিড সদৃশ ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে তারা একই ধরন অবলম্বন করেন। তারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি বিশেষ সহযোগী শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ শাসক বর্গ এদেশে রাজনেতিক ক্ষমতায় দৃঢ় অবস্থান নিলেও তাদের উদ্যোগে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে ১৮৩৫ সালে। তারপর দীর্ঘ দিন ধরে তারা শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী না হয়েও বরং ক্ষমতা বিস্তার ক্ষমতা সংহত করণ এবং মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারত বর্ষে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবের সাথে যখন শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তখন কোম্পানীর একজন পরিচালক বলেছিলেন, "We had just lost America from our folly, in having allowed the

---

১৮ Worsely and etals, Introducing Sociology, P. 167.

১৯ T. B. Bottomore, opcit, P. 270.

Dhaka University Institutional Repository

establishment of schools and colleges and that it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to India."[২০]

এখানে একথাটি বলা প্রয়োজন যে, ১৮৫৩ সালে ঈষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর সনদ নবায়নের পূর্বে ভারতবর্ষের শিক্ষার অবস্থা যাচাই করে দেখার জন্য একটি সংসদীয় কমিটির উদ্যোগে অনুসন্ধান চালানো হয়, যার উপর ভিত্তি করে ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উড তাঁর ঐতিহাসিক শিক্ষা ডেসপাচ প্রনয়ন করেন। উক্ত ডেসপাচ সম্পার্কে অপর্না বসু বলেন,"The result was wood's despatch, so called offer sir charles wood, the then president of the Board of control.Wood's Despatch looked forward to a time when the government would no longer have to maintain a system of education."[২১] বলা যায়, উডের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে।

উডের ডেসপাচ নানা দিক থেকে মেকলের শিক্ষানীতির বিরোধী ছিল। এখানেই নীতিগত ভাবে "নিম্ন পরিশ্রাবন নীতি" বাতিল হয়ে যায়। শিক্ষা বিস্তারে এখানে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করা এবং দেশীয় ঐতিহ্যবাহী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোকে জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ভিত হিসেবে ব্যবহার করার সুপারিশ ও উডের ডেসপাচে রয়েছে।

১৮৫৫ সালে উডের সুপারিশ ক্রমে গঠিত হয় Department of public Instructions এবং ১৮৫৭ সালে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যথা (কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ) এ সময়কালে নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষাসহ উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮৫৪ সালে ডেসপাচের পর এ দেশের

---

২০ Statement of John Marshman, 15 June,1953, P. 113

২১ Aparna Basu, opcit, P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটেছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভাইসরয় লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারী উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত। উক্ত কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন। তাই ১৮৫৪ সালের ডেসপাচ যে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল তা বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৭০ দশক থেকে সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এটি অবশ্যই ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮৩-৮৪ সালে হান্টার কমিশনের সুপারিশক্রমে গৃহীত হয় দুটি নূতন আইন। যার একটি হচ্ছে " মিউনিসিপ্যাল আইন" এবং অন্যটি হচ্ছে "স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত আইন"। কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকারী আওতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করে দুটি স্থানীয় সংস্থার হাতে অর্পন করা হয়। ১৮৫৪ সালের ডেসপাচ ও ১৮৮২ সালের কমিশন মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষা বিস্তারে প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগকেই উৎসাহিত করেছেন। এ সময় ঐ কমিশন শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নয়নের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। যদিও তা পরবর্তীতে কার্যকর হয়নি । এরপর ১৯০১ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় শিক্ষক সম্মেলন। ভারতীয় কোন প্রতিনিধি অবশ্য এতে উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্মেলনে শিক্ষারমান উন্নয়ন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশা- পাশি সরকারী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, চিকিৎসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। সে যা হোক, উক্ত শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহের আংশিক বাস্তবায়ন ঘটে।

পাকিস্তান আমালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ১৯৪৭ - ১৯৭১ সাল

বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচলিত শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ করতে গেলে সংগত কারণেই এদেশের শিক্ষার ইতিহাস এবং ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতির বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের শিক্ষা এ উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়ও রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে আলাদা নয়। তাই ১৭৯২ সালের চালর্স গ্রান্টের শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশমালা,

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৫ সালের মেকলের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন, ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম এডামসের শিক্ষা বিষয়ক জরিপ, ১৮৫৭ সালে চার্লস উডের শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপাচ, ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন এবং ১৯০১ সালে সিমলায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন, ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯১২ সালে 'নাথন' কমিশন রিপোর্ট পেশ, ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাব, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার এবং ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্টে ভারতের শিক্ষা কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব ইত্যাদির পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এসবের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভাজন ঘটে এবং প্রায় ২০০ বৎসরের ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন । উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের মধ্যদিয়ে আপাত দৃষ্টিতে বৃটিশরা এদেশ থেকে চলে গেলেও পরোক্ষভাবে তাদেরসহযোগী এলিট শ্রেণীর লোকজনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। নতুন করে তারা আবার তাদের মিত্র হিসেবে বৃটেনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হলেন, তাদের কৌশল অনুযায়ী দেশকে শাসন এবং শোষণ করর প্রক্রিয়া অবলম্বন করলেন। ফলে পাকিস্তানের এই প্রথম শিক্ষা সম্মেলনেও একটি বিশেষ এলিট শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত হলো।

অতঃপর ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের দ্বিতীয় শিক্ষা সম্মেলন। এখানেও ঠিক একই মানসিকতায় পূর্বের শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটে। ফলে গুটি কয়েক লোকের স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল থাকে অবশ্য ১৯৫২ সালে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে যে, শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয় সেখানে কতিপয় ভাল সুপারিশ ও সংযুক্ত হয়েছিল। যদিও উক্ত কমিটি বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা বলে তাকে সংস্কার করে মুসলিম ভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।[২২] ১৯৫৫ সালে প্রণীত হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। শিক্ষাকেও এই সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতাধীনে আনা হয়। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্ধ করা

---

২২ মাহবুর রহমান, বাংলাদেশের শিক্ষা সংকট ও উৎস , পৃ- ২৮

Dhaka University Institutional Repository

হয় ৫৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, যার সিংহ ভাগই ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা প্রসারের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানেরপ্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ১৯৫৭ সালে গঠিত হয় শিক্ষা সংস্কার কমিশন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা সচিব ডঃ এস, এম, শরীফের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৬১ -৬২ শিক্ষা বর্ষ থেকে রিপোর্টের বাস্তবায়ন শুরু হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্ম্পকে উক্ত রিপোর্টে বলা হয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে পাকিস্তানী জাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিবোধ প্রতিফলিত করা, পাকিস্তানের জাতীয় জাগরণ ও জাতগঠন, নয়া পাকিস্তানের আদর্শ নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

শরীফ কমিশন রিপোর্টের প্রস্তাবনার মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১। শিক্ষা কাঠামোকে তিনভগে বিভক্তকরন। যেমন, ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা, ৭ বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা ও ৩ বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স।

২। প্রাথমিক শিক্ষার ৫০ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষার ২০ শতাংশ ব্যয়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল গড়ে তোলার পরিল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৩। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, যাদের সামর্থ্য আছে তারাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এখানে সামর্থ্য বলতে আর্থিক সামর্থ্যের কথাই বলা হয়েছে।

৪। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করে। ছাত্র- শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার প্রস্তাব রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫। কমিশন পাকিস্তানের জন্য একটি সাধারণ ভাষা প্রবর্তনের জন্য পরীক্ষা করে দেখার সুপারিশ উত্থাপন করে এবং উর্দু ও বাংলার সাধারণ শব্দ গুলো চিহ্নিত করে ও তাদেরকে কাছাকাছি এনে একটি অভিন্ন ভাষা তৈরী করার বিষয়ও কমিশন বিবেচনায় নিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মৌলিক পরামর্শ গুলো নিয়ে ছাত্রদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এমনকি, ১৯৬২ সালের এক পর্যায়ে এই কমিশন রিপোর্ট বাতিল ও নতুন গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে গড়ে উঠে ভঙ্গী ছাত্র আন্দোলন। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের ফলে সরকার কমিশনের প্রস্তাবিত ৩বছরের ডিগ্রী কোর্স বাতিল করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান ও শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য সরকার ১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন ১৯৬৬ সালে তাদের রিপোর্টে পেশ করে। মজার ব্যাপার এই যে, উক্ত রিপোর্টে ও ছাত্র অসন্তোষের কারণ হিসেবে ছাত্র-রাজনীতি ও জাতীয় রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে ছাত্র সংগঠন পরিচালনাকে দায়ী করা হয়। স্কুলের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণও ছাত্র সংগঠন গুলোর কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়।

অতঃপর ১৯৬৯ সালের তীব্র ছাত্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পদত্যাগের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় আসার পর এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি শিক্ষা বিষয়ক কমিটি। কমিটি এ বছরের জুলাই মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করা, শিক্ষকতায় মেধাবী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটানো এবং একটি শিক্ষিত সমাজ গঠন করা।[২৪] উল্লেখ্য যে, এটাই পাকিস্তান আমালের শিক্ষা বিষয়ক সর্বশেষ সরকারী পদক্ষেপ। এই রিপোর্টের বাস্তবায়ন সংগত কারণেই সম্ভব হয়নি।

---

২৪ নিতাই দাস, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি, পৃ- ৩২

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ১৯৭১- ১৯৯৭

অবশেষে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাস্তব কারণেই স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সামগ্রিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করে একটি নূতন শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে ধারণ করে যে সংবিধান গড়ে ওঠে তার ১৭ নং অনুচ্ছেদে তাই শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়;

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

খ) সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টি করা।

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মাঝে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২৫]

১৯৭২ সালের ২৬ শে জুলাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দেশের কৃতি সন্তান, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরাত-এ- খুদার নেতৃত্বে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকদের নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। এটি 'খুদা কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এর প্রতিবেদনটিও 'খুদা কমিশন রিপোর্ট' নামে অভিহিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর কমিশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি - বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ- নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

---

২৫ বাংলাদেশের সংবিধান, পৃঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সকল শহীদের আত্মদানের মূলমন্ত্রকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে ডঃ কুদরাত-ই খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে।[২৬] এই রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে; জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা, প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িকশ্রম মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নও রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা। কমিশনের প্রস্তাবনার মূল বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে;

ক) শিক্ষার মূল কাঠামোকে চারটি ভাগে বিভক্তকরণ। এগুলো হচ্ছে, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর।

খ) ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা।

গ) মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান।

ঘ) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে পূর্ণ আবাসিক করে চারটি বিভাগে ৪ টি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলা।

ঙ) শিক্ষাখাতে অবিলম্বে জাতীয় আয়ের ৫% ব্যয় বরাদ্ধ এবং অদূর ভবিষ্যতে ৭% এ উন্নীত করা। সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণ জাতীয়করণ করার জন্য জাতীয় বাজেটের ২৫% ব্যয় শিক্ষাখাতে বরাদ্ধ করা।

চ) দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ছাত্রদের নিয়োগ করা, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বীকৃতি দেওয়া।

---

২৬ বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ আমাদের নিবেদন -১।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত অর্থনীতির উপর নির্ভর করে সদ্য স্বাধীন দেশের বাস্তবতাকে ধারণ করে একটি গণতান্ত্রিক ও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রবর্তনের প্রয়াস উক্ত সরকার ও কমিশনের সুপারিশ থাকলেও তা অংকুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক পরিবর্তনের ফলে তার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সে যা হোক, আজকের সমালোচকদের কেউ কেউ এই ক্ষুদে কমিশনের প্রস্তাবনাকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মেনে না নিলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা- উত্তর সামাজিক পরিস্থিতি ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল অনেক বেশী আত্মনির্ভর, দেশীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম সমৃদ্ধ একথা হয়তো বলা যায়।

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমত সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়। ফলে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারী অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রস্তুত করা হয়। এই রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়; "জনগনকে সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ ও মানবিক চিত্ত বিকাশের জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করার জন্য সুযোগ প্রদান করা এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুষ্ঠু চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।"[২৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের পুর্বেই কাজী জাফর বরখাস্ত হলে পরবর্তীতে এটাও স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর তার সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় কতক সংস্কার ও পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান (বর্তমানে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট) এক ঘোষণায় নতুন শিক্ষা নীতির রূপরেখা তুলে ধরেন। ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদখানের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের

---

২৭ অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি, শিক্ষামন্ত্রনালয়, পৃঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্ররা দেশব্যাপী আন্দোলন করে । এই কমিশনের রিপোর্টকে ছাত্ররা গণবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছাত্রদের তীব্র আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সরকার এক পর্যায়ে এই শিক্ষা প্রস্তাবকে স্থগিত করে দেন। যদিও পরবর্তীতে পরোক্ষভাবে নানা কৌশলে এর অংশ বিশেষ ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হতে থাকে। মজিদ খানের শিক্ষানীতির মূল কথা হচ্ছে মেধা নয় অর্থই হচ্ছে শিক্ষার সুযোগের অন্যতম মাপকাঠি। উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগ তারাই লাভ করবে যাদের টাকা আছে অর্থাৎশতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষা খরচ প্রদান কারীর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়।[২৮]

এরশাদ সরকারের আমলেই ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দীনের নেতৃত্বে আয়কর শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশনের খসড়া প্রস্তাবনা কিছু কিছু পত্রিকান্তরে প্রকাশিত ও হয়েছে। শুরু থেকেই সমাজের নানা সচেতন মহল একে একটি সাম্প্রদায়িক ও গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের নীল নক্শা হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাদের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যকে টিকিয়ে রেখে শিক্ষা সংকোচন এবং শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় পরিচালিত করার একটি অশুভ ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই শিক্ষা প্রস্তাব। এই শিক্ষা প্রস্তাবে একদিকে যেমনি মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ; অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব ও রাখা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে "শিক্ষা বার্তা" নামক পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হেনা দাসের বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন যে, "মফিজ কমিশন শিক্ষা রিপোর্ট একটি প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী রিপোর্ট, যার ভিত্তি হচ্ছে সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। তাই রিপোর্টে রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি, একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের সমানাধিকারের নীতির বিরুদ্ধাচারণ,

---

২৮ নিতাই দাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের প্রসার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে ও প্রকৃত জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সঠিক শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টির উপাদান"।[২৯]

উল্লেখ্য যে, সরকার সরাসরি এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা ঘোষনা না করলেও ইতিমধ্যে এর অনেক কিছুর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তবে অধিকাংশই পরোক্ষভাবে নানা কৌশলে করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে সমাজের সচেতন মহলের মতামতের ভিত্তিতে একটি গণমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা আজও সম্ভব হয়নি। শিক্ষানীতি বিহীন একটি অদ্ভূত পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যদিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। কোন দেশের উন্নয়নের নির্ঘন্ট সমূহের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। বাংলাদেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষা বিবেচিত হলেও এর প্রসারে সরকারের নীতিগত দুর্বলতা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কই অনেকাংশে দায়ী। একটি অনুকূল আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মূল্যবোধ ও চেতানার ভিত্তিতে একটি গণমুখী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী এস. কে, সাদেক "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার সমস্যা চিহ্নত করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেষ্টা ও শিক্ষিতের হার বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন। ইতিমধ্যে খুদা কমিশনের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শামসুল হকের নেতত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। কমিটি উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর তাঁর সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষেরমূল দল আওয়ামীলীগ এখন বংলাদেশের সরকার পরিচালনা করছে।

---

২৯ হেনা দাস, মফিজ শিক্ষা কমিশন; সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, শিক্ষাবার্তা, পৃঃ ১৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ বিগত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষাখাতে অর্থায়ণের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা ১৯৪৭-১৯৯৭

একথা বলাই বাহুল্য যে, একটি জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার তাৎপর্য অপরিসীম। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের অন্যতম মৌলিক মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষিত লোকের হার বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করছে সমগ্র দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাফল্য। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে পারে তেমনি একটি শিক্ষিত জাতিই পারে একটি দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। উক্ত ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তার সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে চিহ্নিত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় ঃ

১) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য।

২) সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ও সেজন্য প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; এবং

৩) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবে।[১]

উপরে উল্লিখিত সব কিছুর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ার কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো আজ ধসে পড়ার সামিল। শিক্ষাঙ্গন গুলোতে বিরাজ করছে আজ নানা সংকট। এর ফলে সমাজের সঠিক উন্নয়ন তথা কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও শিল্পের

---

১ বাংলাদেশ সংবিধান, পৃঃ- ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে আজ শিক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। বরং সংকট ক্রমশই বেড়েই চলছে। এ কারণে জাতীয় জীবনে চরম হতাশা বিরাজ করছে।

তাছাড়া, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২৬ বছর পরও আমাদের দেশে আজও প্রণীত হয়নি শিক্ষার কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সর্বজনীন নীতিমালা। বরং বৈষম্যের চিরাচরিত ধারায় বিরাজ করছে নানা সমস্যা। শিক্ষাখাতে বাজেট প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধি ও সরকারী দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বেসরকারী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে ক্রমশই উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাই "সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ" একথা গুলো প্রায়শঃই বলা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে ভিন্ন। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের শিক্ষানীতির ঘোষণায় এটি সুপরিস্ফুট সেখানে বলা হয়েছিল যে, শিক্ষার সুযোগ নির্ভর করবে -- "Fifty percent on the basis of money and fifty percent on merit basis." "অর্থাৎ শিক্ষালাভের জন্য অর্থ ও মেধা দুটোই প্রয়োজন, মেধাই যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সংকট, শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম- শহরের বৈষম্য, সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষা ঃ ঢাকা শহরের কতিপয় স্কুল ও কলেজের উপর একটি সমীক্ষা ইত্যাদি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান নানা সংকট কে সনাক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি। আর বিদ্যমান এই সংকট গুলোকে নিরসনের সাথে যে বিষয়টি সবচেয়ে বিশী গুরুত্বপূর্ণ সেটিই হচ্ছে অর্থায়ন তথা শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্ধ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধির প্রশ্নটি সংগত কারণেই অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, এক্ষেত্রে সবসময়ই শুভংকরের ফাঁকি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্ধ না করে বরং ক্রমশই হ্রাস করা হচ্ছে। এটি বিভিন্ন পরিকল্পনায় লক্ষণীয়। নীচের দুটি সারণীতে তা স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.১

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা পরিস্থিতি

↓

পরিকল্পনা	মোট বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি)	শিক্ষাখাত (কোটি)	শতকরা হার
প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক যুক্তভাবে	৫৪৩৩.০০	২৫৮.৮৬	৪.৭৬%
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক	১৬০.৬০	৫০৯.৫১	৩.১৭%
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক	৩৮৬০.০০	১১৮০.০০	৩.০৫%

উৎস ঃ শিক্ষা গবেশণা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।

শুধু তাই নয়, ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে যেখানে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের জন্য শিক্ষাখাতে রাজস্ব বাজেটের ২১.১৪% বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে প্রায় ১২ কোটি লোকের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০.৩৩%।

সারণী ঃ ৩.২

শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের পরিবর্তন

↓

সরকারের বিভিন্ন উৎস	১৯৭৬-৭৯ অর্থবছর গুলোর গড় (কোটি টাকা)	১৯৮৬-৮৯অর্থ বছর গুলোর গড় (কোটি টাকা)	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ)
মোট সরকারী ব্যয়	২২২৬৬	৯,৪৪৮	১৫.৩
রাজস্বখাত	৯৯৬	৪,৬৪৭	১৬.৭
উন্নয়ন খাত	১২৭৬	৪,৮০১	১৪.২
শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	১৮৬	১,০৫২	১৮.৯
রাজস্বখাত	১২১	৮০১	২০.০
উন্নয়ন খাত	৫৭	২৫০	১৫.৯
শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ	৮.২	১১.১	৩.১

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার।

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থায়নের যে তথ্যচিত্র পূর্বোক্ত দু'টি সারণীতে আমরা দেখতে পাই তারই পেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ১৫ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে পড়ে ৩৯ জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, গ্রামের শতকরা ৫০% শিশুর স্কুলে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, শিক্ষার হার বৃদ্ধির পরিমাণ অতীব নগন্য। শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখতে না পারায় ছাত্র সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে, হতাশা, বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে সমাজ জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তারমধ্যে গত ৭/৮ বছরে দেশে ৩/৪টি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মূলত শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে নেয়া হয়েছে ফলেহ আপাত ঃ দৃষ্টিতে একদিকে যদিও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছে বলে দেখানো হচ্ছে, তথাপি অন্যদিকে বিদ্যমান উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। অথচ বিগত সরকার গুলো এ দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বাজেট, বৃদ্ধি না করে নির্দিষ্ট বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছেন। ফলে বিদ্যমান শিক্ষা অবকাঠামোটিই ভেঙ্গে পড়ার সামিল হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এখানে যে সময়ে কলাভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল, সে সময়কার ছাত্রের তুলনায় আজকে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ গুন। অথচ কলাভবনের আয়তন, ক্লাসরুমের সংখ্যা, গবেষণাগার, পাঠাগার, ছাত্রবাস, সে অনুপাতে মোটেই বাড়েনি। তাই এক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধু মাত্র নতুন নতুন শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলেই চলবে না। সেই সাথে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতেও যথাযথ শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আর এর সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি। শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য দেশের ছাত্র সমাজ, শিক্ষক মন্ডলী ও

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞজনসহ সচেতন মহল অব্যাহতভাবে দাবী জানিয়ে আসলেও সরকার এক্ষেত্রে আশানুরূপ কোন কিছুই করছেন না বলা যায়। একারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট মোচন করাতে যাচেছ- ই না বরং দেখা দিচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের স্বল্পতা এবং ভর্তি সংকট ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশে যেখানে বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ রয়েছে মাত্র ২০ হাজার ছাত্রের, সেখানে প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক ছাত্র- ছাত্রী ভালফল করলেও প্রায় ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৫% ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সেজন্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "উন্নয়নশীল দেশ সমূহে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ" শীর্ষক পুস্তিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, "বহু উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিকাশ এখনও নিম্নস্তরে এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ছে। ফলে শিক্ষাখাতে ব্যয় দ্বিগুণ না করা হলে ২০২৫ সাল নাগাদ সেখানে সর্বজনীন শিক্ষাদান অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতায় হতাশা ব্যক্ত করে তাদের একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে "পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়শীল দেশের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয় প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচেছ যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয় ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বর্ধিত না করলে দেশের যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়।[২]

এমনকি, বাংলাদেশের সাহায্যদাতা গোষ্ঠী প্যারিস কনসোটিয়ামের বৈঠকেও (১৯৮৮) বাংলাদেশের জন্য শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় বাজেটে এই খাতের জন্য সর্বাধিক বরাদ্দের

---

২ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৩, পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না দিয়ে সামরিক খাতসহ অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে বাজেট বৃদ্ধি করেছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে যেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল রাজস্ব বাজেটের ২১.১৪% (৪৫.০৬ কোটি টাকা), সেখানে সামরিক খাতে বরাদ্দ ছিল ৯.৪৬% (২১.১৬ কোটি টাকা), আর অন্যদিকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয় ১০.৩৩% কিন্তু সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয় রাজস্ব বাজেটের ১১.৩৬%। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৭২-৭৩ অর্থ বছরে যেখানে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সামরিক খাতের তুলনায় ২২৩ গুণ বেশী ছিল, সেখানে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে সামরিক খাতে বরাদ্দ শিক্ষাখাতের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩০ গুণ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৩

রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার পাশাপাশি অবস্থান

↓

অর্থবছর	মোট রাজস্ব ব্যয় (কোটি)	শিক্ষাখাতে ব্যয় (কোটি)	শতকরা হার	প্রতিরক্ষা (কোটি)	শতকরা (হার)
১৯৭১-৭৩	২১৩.১১	৪৫.০৬	২১.১৪	২০.১৬	৯.৪৬
৭৩-৭৪	৩৪৬.২০	৬৪.৮২	১৮.৭২	৪১.৯৬	১২.১২
৭৪-৭৫	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	১৪.৫৩	৭০.৮৫	১২.৫৩
৭৫-৭৬	৬৩৬.০৩	৮৩.৪৫	১৩.১২	১১০.৯৩	১৭.৪৪
৭৬-৭৭	৭৬৯.৩১	৯৮.২১	১২.৭৬	১৫১.৩৯	১৯.৬৮
৭৭-৭৮	৯৪০.৬৫	১২৬.৪৯	১৩.৪৪	১৪৪.১৭	১৫.৩৩
৭৮-৭৯	১০৮৭.৫৮	১৬৬.৫০	১৫.৩০	১৪৮.৪৭	১৩.৬৫
৭৯-৮০	১৩১৪.৯৮	১৭২.৮২	১২.৮৭	২৪২.৬৭	১৮.০৮
৮০-৮১	১৪৮১.৫৬	২০৬.৫৪	১৩.৯৪	২৭৪.১৯	১৮.৫০
৮১-৮২	১৮৪৯.৬৮	২৩১.৬৪	১২.৫২	৩৪৭.৫৬	১৮.৭৯
৮২-৮৩	২১৪৬.৭০	২৯৪.২১	১৩.৭০	৪১৮.৩৬	১৯.৪৯
৮৩-৮৪	২৫০৩.০০	৩৬৫.১৭	১৪.৫৮	৪২৭.০৮	১৭.০৬
৮৪-৮৫	২৯৩০.০০	৪৯২.৭২	১৬.৮১	৪৯২.০৮	১৬.৮৫২
৮৫-৮৬	৩৩১৩.০০	৪৮৭.০০	১৪.৭১	৪৬৫.০৮	১৪.০৩
৮৬-৮৭	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি
৮৭-৮৮	৪,৪৮১.০০	৭৭৫.৬২	৪৪.৫৮	৭৬৮.৫০	১৪.৪৫
৮৮-৮৯	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	১৫.০৮	তথ্যপাওয়া যায়নি	১৬.৬
৮৯-৯০	৭১৮০.৫৩	৯৭০.১১	তথ্যপাওয়া যায়নি	১০০৯.৪২	তথ্যপাওয়া যায়নি
৯০-৯১	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি
৯১-৯২	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি	তথ্যপাওয়া যায়নি
৯২-৯৩	১৬১১৮৫.৯০	১৬৭৪.৯৩	১০.৩৯	১৫০৯৬.২২	৯.৩৬
৯৩-৯৪	১৮৪০৮৮.৬১	১৭৫৫৭.৫০	৯.৫৪	১৭৪৪০.৩০	৯.৪৮
৯৪-৯৫	১৮৪৫০০.৯৮	২০০৭৭.৩৩	১০.৮৮	২১২৬৭.৮০	০.১৬
৯৫-৯৬	২১৬২৭৬.১২	২১৪৯৩.৭৩	১০.৩৪	২৩০৯৬.২৪	১১.১১
৯৭-৯৭	২০৭৯১৫.২৭	২২৩৩২.৭৭	১০.৩৩	২৪৫৫৮.৮৩	১১.৩৬

উৎসঃ শিক্ষা গবেষণা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

ফলে স্বাধীনতার প্রায় ২৬ বছর পর যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ৩টি (তাও বিদেশী অনুদানে), সেখানে ক্যান্টনমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ৭টি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার অর্ধেকের চেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হারের চিত্রও অনুরূপ । শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের সাথে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন মানের ব্যাপারটি খুবই প্রাসঙ্গিক । কেননা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই অধিক সংখ্যায় লেখা পড়া করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৮৬-৮৭ সালের প্রথম ৯ মাসে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন যাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১.৬১ ভাগ। ১৯৮৫-৮৬ সালের প্রথম ৯মাসে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৯.৪৮ ভাগ। ১৯৮৬-৮৭ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপে এই হিসেব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপে ১৯৭৩-৭৪ সালকে সূচক বর্ষ হিসেবে ধরে নিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সারণী ঃ ৩.৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার

↓

প্রতিষ্ঠান	সময়কাল	বৃদ্ধির হার
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৭২-৮২	১.৪০
মাদ্রাসা	১৯৭৮-৮৪	২০.০৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৭৮-৮৪	৭.১৪
মহাবিদ্যালয়	১৯৭৮-৮৪	৯.০৫
বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭২-৮৭	১৬.০৬

উৎস ঃ আনু মুহাম্মদ, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সামাজিক বাস্তবতা ১৯৮৮, পৃঃ ১২২

অধিকন্তু শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা উপকরণের মূল্য, ছাত্রবেতন, পরীক্ষা ও সেশন ফি ইত্যাদি। ফলে ছাত্রদের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ড্রপ- আউটের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে, ছাত্রসংখ্য তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে

Dhaka University Institutional Repository

কমছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে সামাজিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুধু ব্যাহতই হবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে।

এক্ষেত্রে "এসকাপ" (Educational scientific and cultural organization of Asia and pacific) এর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপর পরিচালিত গবেষণার রিপোর্টটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টে বলা হয়, "অত্র অঞ্চলে শিক্ষার সংকটের মূল কারণ হচ্ছে সরকারী অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতা সামাজিক খাত সহ- অন্যান্য অনুৎপাদনশীল বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বরাদ্দের কারণে শিক্ষার মতো একটি মৌলিক খাত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। এ মতামত ব্যক্ত করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট নিরসনে সামরিক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষাখাতে আরো অধিক বরাদ্দের দাবী জানানো হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অত্র এলাকার দেশগুলোতে অনুৎপাদনশীল অনেক খাতে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। সমরশক্তি বৃদ্ধির নামে অনেক দেশেই বিপুল পরিমান অর্থের অপচয় হচ্ছে এ ছাড়া বিলাসী পরিকল্পনার পিছনেও কম অর্থ ব্যয় হচ্ছে না অথচ এসব অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়ে আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধ ও বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়েও শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে শিক্ষার সংকট সমাধান করা সম্ভব।"

আধুনিক সমাজ গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার অপরিসীম অবদান সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেকোন দ্বিমত নেই। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন শিক্ষা সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় নয়, বরং এটি একটি ব্যয় বহুল সমাজ সেবামূলক কাজ। আংশিকভাবে এর কারণ ছিল এই যে, শিল্প ও ব্যবসায়ের যেরূপ লাভ লোকসানের খতিয়ান করার রীতি আছে, শিক্ষার ব্যাপারে সেরূপ খতিয়ান করা সহজ নয়। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগের ফলে যে বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাতে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অনেক খানি নিয়ন্ত্রণ করেন। একটি

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা না করলে এধরনের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যাবে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে, শিল্পে মুলধন বিনিয়োগকে আমরা যেভাবে দেখি অনেকটা সেভাবে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয় কে দেখার অর্থাৎ তাকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য উপায় হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

শিক্ষা এবং উৎপাদনের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্র সমূহে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি গোচর হয়। সে যা হোক, এ সব যুক্তি সকল ধরনের শিক্ষা সম্পর্কে কম বেশী প্রযোজ্য। উন্নত দেশ গুলোতে দেখা যায় যে, দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এবং ট্রেনিংয়ের জন্য সহজেই সাড়া দেয় এরূপ বহু সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষা শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করছে। এসব দেশে একথা স্বীকৃত যে, বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার এবং ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাপকভাবে বহুসংখ্যক লোকের দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসব আবিস্কার ও উদ্ভাবনের সুফল দেখা দেয়। এভাবে চিন্তাধারা বাস্তব ক্ষেত্রে তখনই কাজে পরিণত হতে পারে যখন জনসাধারণ এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সুফল দেখা দেয়। এভাবে চিন্তাধারা বাস্তব ক্ষেত্রে তখনই কাজে পরিণত হতে পারে যখন জনসাধারণ এসব বোঝার প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করে। অতএব অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, এরূপ শিক্ষার ফলে গবেষকদের চিন্তাধারা কাজে পরিণত করার উপযোগী লোকের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু শিক্ষিত শ্রমিকদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ বেশি এবং শিল্পোয়নের গুরুত্ব ও তারা বুঝতে পারে। তার ফলে অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে তারা কাজ করে এবং শিল্প কারখানার সম্প্রসারণেও উৎসাহ যোগায়। শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রণী দেশ সমূহের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণই যে শুধু এ অভিমত পোষণ করেন তা নয়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং জনসাধারণেরও একটি বিরাট অংশ বিষয়টি স্বীকার করেন। ফলে ক্রমশঃ উচ্চতর হারে শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়ের অনুকূল মনোভাব দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম শিক্ষা, বিশেষতঃ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি এবং কৃষি বিদ্যা ব্যয়বহুল। প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের সপক্ষে প্রবল যুক্তি না থাকলে সরকার অথবা জনসাধারণ কেউই একটি সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য অর্থ ব্যয় করবেন না। জাতির শিক্ষা প্রচেষ্টার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশা যে, সরকার এবং জনসাধারণ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ও অপরিহার্য সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করবেন।

সে হোক, আমরা নিজেরাই এ সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা পোষণ করি বলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক কারিগরি ও কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছি, যাতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষার যথোপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। সেজন্য এর প্রত্যেকটি স্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার জন্য অত্যাবশ্যক মনোভঙ্গীর বিকাশও অভ্যাস গঠন এবং এজন্য আবশ্যকীয় মূল্যবোধ সঞ্চয়ের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন যে, শিক্ষা প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ -সুবিধার উপরেই নির্ভর করবে। আবার এগুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার এবং অর্থ ব্যয়ের জন্য সরকার ও সমাজের সম্মতির সঙ্গে। আমাদের বিশ্বাস ও আশা সকলে উপলব্ধি ও স্বীকার করবেন যে, সম্পদ সৃষ্টির একটি পন্থা হচ্ছে শিক্ষ, শুধু ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল জীবন-যাপনের অনির্দিষ্ট অর্থেই নয়, অর্থনৈতিক উন্নতিতে সরাসরি ভাবে এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে সাহায্যের অর্থেই। ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত যেসব দেশের অর্থনৈতিক শিক্ষার সুফল দেখা দিয়েছে সেসব দেশের সকলে এ কথা উপলব্ধি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকেও শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মাধ্যমেই উল্লেখযোগ্য সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব।

শিক্ষাখাতে অর্থসংস্থানের প্রশ্নটি তিনটি অংশে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

ক) দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা দরকার ?

খ) বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে এই ব্যয় বন্টন করা হবে ?

গ) আমাদের শিক্ষখাতে অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি কি হবে ?

প্রশ্নগুলো সমাধানের কোন সর্বজন স্বীকৃত পন্থা নেই। তবে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ নির্ধারণ পদ্ধতি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই যুক্তযুক্ত। এই পদ্ধতিতে দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত দক্ষতার প্রয়োজন তাকে নীতি নির্ধারক রূপে ব্যবহার করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য ও যাতে পূর্ণ হয় সেদিকে ও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জনশক্তি সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে যেন পরিকল্পনা রচিত না হয় সে সম্পর্কেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। জনশক্তি সম্পর্কে এই পূর্বানুমান খুব সঠিক ও বিস্তারিতভাবে করা সম্ভব নয়। তবে এই পূর্বানুমান যত বিস্তারিতভাবে হবে, শিক্ষা পরিকল্পনাও তত বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এমনকি যদি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য প্রাক অনুমান করা নাও যায় এবং শুধু মূল ব্যক্তিগত শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয় জনসম্পদের একটা মোটামুটি দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বানুমান করা হয়, তাও শিক্ষা পরিকল্পনার পক্ষে খুবই কার্যকর হবে। সতরাং আজ থেকে ১০/১৫ বছর পরে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তার জন্য কি পরিমাণ শিক্ষিত জনসম্পদের প্রয়োজন সে সমীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্বানুমান নেই যা আগামী দশ-বিশ বছরের শিক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এ অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তথ্য থেকে আমরা নীতিগ্রহণ করতে পারি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় তাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমাংশে বহু অগ্রসর দেশের শিক্ষায় শুধু সরকারী ব্যয়ই ছিল জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৮% এর মধ্যে, অথচ এই সময় বাংলাদেশেএই অনুপাত ছিল ১% এর মত এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব অনুযায়ী তা পায় ১.৮%। বাংলাদেশের এই উভয় পরিমাণই আমাদের প্রতিবেশী কিংবা আমাদের মত যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক কম। অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টার তুলনায় বাংলাদেশ সরকার কোন সময়েই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা দেননি। প্রায়ই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষা বাবদ ব্যয় সাধ্যানুযায়ী করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের সম্পদ সীমিত, কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অক্ষম। এর মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য আছে। আমরা হঠাৎ এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি গঠনের আশা করতে পারি না যে, ব্যক্তির দিক দিয়ে আমাদের কয়েকগুণ বেশী সম্পদের অধিকারী দেশসমূহের শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু- আমাদের সম্পদ সীমিত বলে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যাবে না এ যুক্তি সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধী । এ ব্যাপারে সত্য এই যে, যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত সেহেতু এরূপ একটি শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য আমাদের অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে- যা ভবিষ্যতে আমাদের সম্পদকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যখন আমাদের সম্পদের তুলাদন্ডে আমাদের প্রচেষ্টার মূল্য নির্ণয় করি এবং অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টার সঙ্গে তার তুলনা করি তখন দেখি যে, যেসব দেশের সম্পদ প্রায় আমাদের সমান সেসব দেশ অপেক্ষা আমরা শিক্ষাখাতে আমাদের জাতীয় আয়ের ও মোট রাজস্বের নগন্য অংশ ব্যয় করেছি। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের শিল্পায়িত দেশ গুলোর কথা বাদ দিলেও আমাদের ন্যায় যেসব দেশ যুক্তিসঙ্গত আর্থিক স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টা করছে সে সব দেশের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আর্থিক প্রচেষ্টা নগন্য। আমরা এ সত্য এড়াতে পারি না যে, শিক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় আয়ের এবং সরকারী ব্যয়ের আরও বড় অংশ বরাদ্দ করলে শুধু তবেই এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থা সমূহ কার্যকর করা যাবে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় আদর্শ রূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

যদি আমরা এসকল দিক বিবেচনা করি তহলে আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫% এ উন্নীত করা দরকার এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা যায় তাকে জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এটা অত্যান্ত দূরূহ কাজ। কারণ এটি জাতীয় আয়ের সঙ্গে সরকারের রাজস্ব খাতে আয়ের তুলনা করলেই বোঝা যায়। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনের গুরুত্ব সত্বেও আমাদেরকে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। সহজে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায় হচ্ছে, অধিক ক্ষেত্রে অধিকতর হারে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধিকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার স্তরের মধ্যে শিক্ষা ব্যয় প্রশ্নের সমাধানের জন্যও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা দরকার। যেসব দেশ এখন উন্নত, উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ শিক্ষায় তাদের মোট ব্যয়সাধারণত ঃ কম ছিল এবং তার প্রধান অংশই বিদ্যালয় শিক্ষায় খরচ হত। উন্নতির সংগে

Dhaka University Institutional Repository

সংগে তাদের মোট ব্যয় বাড়াতে থাকে এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যয়ের অনুপাত ক্রমাগত বেড়ে চলে।

আমাদের ১৯৭৩-৭৪ সালে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য মোট শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছিল ঃ

সারণী ঃ ৩.৫

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বরাদ্দের হার

↓

শিক্ষার স্তর	আবর্তক	অনাবর্তক/ মূলধনী
প্রাথমিক শিক্ষা	৬১.৫%	১৭.৯%
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৪.৫%	১৮.৮%
কলেজ শিক্ষা	৬.০%	৫.৮%
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৯.২%	১৩.২%
কারিগরি শিক্ষা	৩.৩%	১২.৮%
অন্যান্য	৫.৫%	৩১.৫%

উৎসঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ২৯৫, সন ১৯৯৬।

প্রাচ্যের একটি শিল্পোন্নত দেশ জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ১৮৮৫ সালে জাপান যখন তার শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা আরম্ভ করে তখন তার মোট শিক্ষার ব্যয়ের ৮৪% প্রাথমিক শিক্ষায় (৬ বছর ব্যাপী) , ৭.৮% মাধ্যমিক শিক্ষায় (স্থিতিকাল ৬ বছর, প্রথম ৩ বছর বাধ্যতামূলক) এবং ৮.২% উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় করে এবং ১৯৬০ সালে তার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ছিল যথাক্রমে ৪২%, ৪৫%, ও ১৩%।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সের (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতে হবে। এ বয়সেই শিক্ষার্থীরা তাদের মৌলিক শিক্ষালাভ করবে এবং যত সত্বর সম্ভব এই বয়সের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই স্তরের শিক্ষা কমপক্ষে ১৫% সম্প্রসারণ করতে হবে। এটা করতে পারলে শুধু যে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন হবে তাই নয়, এতে দেশের শিক্ষা সৌধ প্রসারিত ভিত্তি ভূমির উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারও এর ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার উৎকর্ষ, পরিমাণ ও ধরন দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জনসম্পদের কথা স্মরণ রেখে নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলা চলে যে, আমাদের এখন মানবিক শাখায় বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষায় বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষার উপর অধিকতর জোর প্রদান করে দ্রুততর হারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উৎপন্ন করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য আবশ্যক প্রতি ছাত্র খরচের একেবারে সঠিক তথ্য আমাদের কাছে না থাকলেও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপারিশ করা যায় যে, শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় আয়ের ৫% অর্থ ব্যয় সম্ভবপর করে মোটামুটি ভাবে তার ৬০% প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য ২৫% বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য এবং বাকী ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হোক। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাখাতে এ স্তরের বরাদ্দকৃত অংশের অধিকাংশ নিয়োগ করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ২০০১ সাল নাগাদ সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হলে বর্তমান খরচের ভিত্তিতে ও হিসাব করলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে ২৭০ কোটি টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু গতানুগতিক পন্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে বিশেষ পন্থায় দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে এবং অপচয়ের অবসান ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থাপনের বিষয়টি বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় করলে বিষয়টির জটিলতা কমবে। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণার্থে স্থানীয় শ্রম সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে দ্বিতীয় শিফট চালু করা বা একই গৃহে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা বা গ্রামের সমাজকেন্দ্র, গ্রামবাসীর বহির্বাটী এমনকি হাটের দোকান -ঘর ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা অনাবর্তক বা মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন কমান যেতে পারে। আমাদের সীমিত সম্পদ প্রবণতা ব্যবহৃত হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, বই ও লেখাপড়ার অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য এবং কিছু খরচ হবে চক, খড়ি ও ব্লাক বোর্ডের জন্য। স্কুল গৃহের ভূমি বিত্তবানদের নিকট হতে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

আমাদের মোট শিক্ষা ব্যয়ের প্রায় ৭৫% সরকারী তহবিল থেকে আসে। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হলে বা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সমমান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার অথবা স্থানীয় সংস্থা সমূহের নিয়ন্ত্রাধীন করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যয় সরকারী তহবিল থেকে দিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার দরুন এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা অনুচিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয়, প্রতিশীর্ষ আয়ও সরকারী রাজস্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তবে আমাদের মতে শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কর রাজস্বকে জাতীয় আয়ের বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৮% করতে হবে এবং শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত ৭% থেকে অন্ততঃ ২৫% এ উন্নীত করতে হবে। বর্ধিত হারে সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর, ভূমি কর বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং প্রতিশীর্ষ আয়ের বৃদ্ধি এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব করতে পারে। শিক্ষার জন্য সিগারেট ও গ্যাসোলিনের উপর বিশেষ কর এবং বিশেষ প্রমোদ কর আরোপ করা যেতে পারে। পানি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির উপর শিক্ষা লেভি ধার্য করা যেতে পারে। শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ কর আরোপের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার জন্য স্ব স্ব বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। এক লক্ষাধিক জন- অধ্যুষিত সমস্ত পৌরসভাকে নিজ নিজ এলাকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অন্যান্য পৌরসভাকে দুই- তৃতীয়াংশ এবং জেলা পরিষদ গুলোকে ৩৫% প্রাথমিক ব্যয় সংগ্রহ করতে সমর্থ হতে হবে। বেসরকারী বদান্যতায় উৎসাহ সঞ্চারের জন্য দাতার স্মৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করছে সরকার নতুন কর ধার্য করে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার পরও আরও অর্থের প্রয়োজন হবে এবং এই অর্থ জনসাধারণের হিতৈষনামূলক অর্থদান এবং ছাত্র বেতনের মারফতেই সংগৃহীত হতে পারে, এই অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থার জন্য সকল লোককেই আরও বেশী পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় যে, এর ব্যয়ের শতকরা ৫০% ভাগ ছাত্র বেতন হতে আদায় করা হোক এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তা সহ সরকার বাকী ৫০ ভাগ বহন করুক। এক্ষেত্রে মাতাপিতা ও অভিভাবকদের ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে যে, বিনা বেতনে স্কুল ও কলেজে পড়লেও শিক্ষকগণকে বেতন দিতে হবে, উপকরণ ও সরঞ্জাম কিনতে হবে। এবং স্কুল ও কলেজ গৃহ নির্মাণ ও রক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে, ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে এবং জনসাধারণকে সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। জনসাধারণ যদি ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হয় তবে শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত তাঁরাই উপকৃত হবেন এবং শিক্ষা লাভের ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা নানারূপ সুযোগ-সুবিধা বেশী পরিমাণে পাবে। শিক্ষার প্রত্যক্ষ আর্থিক সুফল হবে জীবন যাত্রার উচ্চতর মান এবং অধিকতর স্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবন যাপন। স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকতর পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারই শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন পূরণের একমাত্র পথ।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়। এসব পরিকল্পনার আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে কাঁচামাল, শ্রমিক ও সরঞ্জাম এবং টেকনিশিয়ান ও উপদেষ্টাদের বাবদেও ব্যয় করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা একবার কার্যকরী হলে তার পরিচালনা ও কাজের জন্য অথবা অন্যত্র অনুরূপ পরিকল্পনার জন্য যে সব লোকের প্রয়োজন হবে তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের জন্য সাধারণতঃ কোন ব্যয় ধরা হয় না। আমাদের পরিকল্পনা সমূহের কাজের জন্য যে-সব লোকের প্রয়োজন তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ব্যয় উন্নয়ন তহবিল হতে বহন করাই যুক্তিসংগত ও অত্যাবশ্যক। এ কারণে আমরা সুপারিশ করি যে, প্রধান প্রধান পরিকল্পনা সমূহের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগ, এবং বড় বড় শিল্প পরিকল্পনা সমূহের ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা উচিত। অন্যান্য দেশে এরূপ রীতি প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৃটেনের কোল বোর্ড, গ্যাস কাউন্সিল এবং সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটি তাদের তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেন। এর ফলে প্রথম অবস্থায় জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাবে, তবে দাম আবার শীঘ্রই কমে যাবে, কেননা কারিগরি ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন মূল্য কমে যাবে। এভাবে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে। জনসাধারণ প্রথমে ব্যয় বহন করলেও পরে উপকৃত হবে ফলশ্রুতিতে সমগ্র জাতি উপকৃত হবে।

এশিয়ার অন্যান্য যে সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে -সব দেশে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপোষকতার জন্য তার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়। আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সুফল প্রসূ করতে হলে বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপনের ব্যাপারে অবশ্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে এবং এজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যেরূপ শিক্ষা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
382833

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক সাহায্য প্রধানত সরকারের অনুরোধ ক্রমেই পাওয়া যায়। সেই সাহায্যের একটি ন্যায় সঙ্গত অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষা ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হোক তা সর্বস্তরের জনগণ আশা করে।

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে আমরা নানা পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছি। বর্তমানে প্রচলিত কয়েক প্রকারের কর বৃদ্ধি, নতুন কর আরোপে, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি , শিক্ষাখাতে ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রদান, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি কয়েক ধরনের উপায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ সকল পন্থার মাধ্যমে এবং অন্যান্য কি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার জন্য অর্থ পাওয়া যেতে পারে , তার উপায়, উদ্ভাবনের ব্যাপারে সরকারকে বিস্তারিতভাবে পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি শিক্ষা প্রশাসক, কর সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।[৩]

এটা বলাই বাহুল্য যে, এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যখন সারা বিশ্বব্যাপী সামরিক খাতসহ অন্যান্য অনুৎপাদনশীল ও অপরিকল্পিত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে মানব সমাজের উন্নয়ন এবং আগামী দিনের সুন্দর ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ঐক্যমত গড়ে উঠেছে যখন ক্রমান্বয়ে পৃথিবী থেকে পৃথিবীথেকে পারমানবিক অস্ত্র হ্রাস পাচ্ছে, ঠিক তখন আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার মতো একটি গুরুর্ত্বপূর্ণ খাতকে অবহেলা করে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি খুবই দুঃখজনক এবং যেটা কখনো কাম্য নয়। পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যার জনসংখ্যার ৮৫% কৃষির উপর নির্ভরশীল গ্রামবাসী। যার ৮০% জনগোষ্ঠীই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। যেখানে অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে

---

৩ বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ২৯২-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

গুটিকয়েক উচ্চবিত্ত, বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা, যেখানে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার গুলোর সুফল ব্যবহার করছে সংখ্যালঘিষ্ট একটি বিশেষ শ্রেণী -যেখানে শিক্ষা ক্রমশই গুটিকয়েক পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে একটি বিশেষ সুবিধা ভোগী শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটাবে এটা পুঁজিবাদের অর্থনীতি নির্ভর তথা পরনির্ভরশীল একটি দেশের জন্য যেমনি স্বাভাবিক তেমনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের শ্রেণীগত রূপটিও-ঐ- বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে ঐ- বিশেষ শ্রেণীর শাসন-শোষন ও অস্তিত্বের স্বার্থেই এই সমস্ত দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নীতিমালায় প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই দেখা যায়। শিক্ষাখাতে বাজেট আনুপাতিক হারে হ্রাস করার পাশাপাশি উৎসাহিত করা হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন, লাভজনক বিন্যাসবহুল ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণকেও, সকলের জন্য শিক্ষা নয় বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই নীতিহীনভাবে, বৈষম্যের প্রবাহমান ধারায় বিশেষ শ্রেনীর স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে একদিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র পীড়িত পরিবারের পক্ষে তাঁদের সন্তানদের ব্যয়বহুল শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখা ন্যূনতম পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে অকল্পনীয় ব্যয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর সন্তানেরা বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করছে। আর এই বিশেষ শ্রেণীটির স্বার্থেই গোটা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রনীত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার মতো একটি অতীবগুরুত্বপূর্ণ খাত চরম অবহেলার শিকার হচ্ছে। দিন দিন শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমছে। আর অনুৎপাদনশীল খাত সমূহে বরাদ্দ বেড়ে চলেছে। বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বিশ্লেষণে তাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এখানে শিক্ষায় বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। পুঁজির সাথে শিক্ষাকে ক্রমশই সম্পৃক্ত করে দেখা হচ্ছে। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামর্থের মাঝে শিক্ষার সুযোগকে নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন - সরকারী অর্থের পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ, সুষ্ঠু নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে আন্তরিক উদ্যোক্তার প্রয়াস- যার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারবে একটি শিক্ষিত সচেতন আত্মনির্ভরশীল জাতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে ত্বরান্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের স্বরূপ

বর্তমানে আমাদের দেশে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাজমান তাতে করে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। তাই একটি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য দূরকরে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রধানতঃ সমাজের একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতিতে কৃষক শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সন্তান- সন্ততিদের প্রতিভা বিকাশের পথে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে । সারাদেশে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনেও অগ্রগতির স্বার্থে দেশব্যাপী শিক্ষার মানের একটি মোটামুটি সমতা বিধান অপরিহার্য। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম, স্ত্রীপুরুষ ভেদ, বয়স প্রভৃতি কারণে যেন কারও প্রতিভার যথাযথ বিকাশও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয় তা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

মূলত ঃ সামাজিক বৈষম্যের ফলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যেরসৃষ্টি হয়। তবে এটাও সত্য যে, উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরুপ বৈষম্য দূরীকরনের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা যায়। আমাদের সমাজের সচেতন ব্যক্তি বর্গের এক বৃহৎ অংশ রক্ষনশীল। এদের পক্ষে শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের মানসিকতা বর্জন অত্যন্ত কঠিন। সমাজের এই অংশ স্বাভাবিক কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ- সুবিধার সমতাবিধানের বিরোধিতা করতে পারে। এরূপ বিরোধিতা অপসারণ করে যদি সতর্কতার সঙ্গে নীচের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা হলে শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা জনগন -ভোগ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার বিশ্বজনীন নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের এ একটি মূলনীতি। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদে ঘোষিত নীতিমালায় এটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ এ মানবাধিকার নীতিটি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হিসেবে নতুনসমাজ গঠন কল্পে এর রূপায়নে পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বহুবিধ সরকারী ঘোষণাপত্রে এর রূপায়নের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যক্তিত্ব, সমাজের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান একটি অপরিহার্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়নীতি এবং প্রধানতঃ এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ শ্রেণী বৈষম্য ও বিদূরিত হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহায়ক ও পরিপূরক তেমনি রাষ্ট্র শিক্ষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সক্ষম ।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের নীতির সহায়ক হিসেবে অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের সুপ্ত শক্তি সমূহের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রধান দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। এ ব্যাপারে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হবে প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং এরূপ সুযোগলাভ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে। বালক- বালিকার প্রবণতা, বুদ্ধি মত্তা ও মেধা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই সুযোগ -সুবধার তারতম্যের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব একই ধরনের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমান সুবিধাপূর্ণ সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সুতরাং সম স্তরের এবং একই ধরনের সকল শিক্ষায়তনের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহ লাভ করবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের নিজেকে উন্নত করার ব্যক্তিগত প্রবণতা একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা এর ধারক হিসেবে নিয়োজিত থাকবে। উচ্চতর শিক্ষার স্তর বা বিশেষ পেশাগত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রবণতা, প্রতিভা এবং মানসিক ও

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক গুনাবলী বিবেচ্য বিষয় হবে। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

নানাবিধ কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান, অতীতে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন আমলে আমাদের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিদেশী শাসকেরা তাদের প্রয়োজনে শ্রেণী ভিত্তিক বা শ্রেণী সৃষ্টিকারী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে গিয়েছে। এই ব্যবস্থা তাদের শাসন, শোষন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপূরক ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক তারতম্য রয়েছে তাও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, নৈরাশ্যবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ, স্বার্থপরতা, রক্ষণশীলতা এবং সর্বোপরি আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বৈষম্যের কারণ গুলোর অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পদক্ষেপের ফলে দূর করা যেতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন কার্যপন্থা অবলম্বনকরতে হবে। এ কার্যপন্থা সমূহের প্রধান কয়েকটির এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক ভাবে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অপরের উপর নির্ভরশীল। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পরেই অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব হয়ে থাকে, অবশ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে পৌছাঁবার পরেই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। কেননা বছরের পর বছর ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অধিকাংশ শিল্পায়িতও উন্নত দেশ ষোল বছর

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে। অবশ্য গোড়ার দিকে তারা এর অনেক কম সময় হতে আরম্ভ করেছিল এবং কালক্রমে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা সার্বজনীন শিক্ষার মেয়াদও বৃদ্ধি করেছে। উন্নত দেশগুলো শিল্পায়নে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলে বাংলাদেশ কে এ সকল শিল্পোন্নত দেশ গুলোর তুলনায় বিবর্তনের সময় কে অবশ্যই স্বল্পকাল স্থায়ী করতে হবে। অবশ্য উন্নত দেশ সমূহে প্রচলিত সার্বজনীন শিক্ষার সমপর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ আমাদের নাই। এখানে আমাদের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রগতি এবং শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তুলবার মত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয় পর্যায়ে কিভাবে পৌছাঁন সম্ভব। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সুনাগরিক তৈরির জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যে সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে দারিদ্র্যই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। দরিদ্র জনগন সন্তানের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারগ। উপরন্ত দারিদ্র্যতার দরুন ছোট ছেলেদের কায়িক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করা হয়। এসব কারণে বহু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় মাতাপিতাকে বহন করতে হতো তা এখন আর লাগছে না। এজন্য স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক, অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ ও বছরে এক সেট স্কুল ইউনিফর্ম ইত্যাদি সরবরাহ করা হলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। তা ছাড়া স্কুলে অল্প মূল্যে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করলে প্রায় সকল পরিবারই ছেলেমেয়েদের স্কুলের সময় কাজে নিয়োজিত না করে স্কুলে পাঠাবার সুযোগ গ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান শহরাঞ্চলের শিক্ষার মানের সমপর্যায়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সকল রকমের ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে। আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপকতা এবং মান উন্নয়নের জন্যও সুপারিশ করেছি। এর ফলে অবশ্য শিক্ষা বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং সেজন্য এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে অভিভাবক, স্কুল , কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মাধ্যমিক স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সকল ছাত্রের বিশেষ ভাল লাগার বিষয়বস্তু বা ঝোঁক এবং আশা-আকাঙ্খা সব সময় একই ধরনের হয় না। যে বিষয়ে তার প্রতিভা রয়েছে, সেই বিষয় উপেক্ষা করে, শুধু শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা অনুসরণের চাপে পড়ে যে বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ নাই এমন বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোন কোন ছাত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়। এর মুল কারণ, নিজের সামর্থ ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে তারা অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে, নিছক মাতাপিতা বা অভিভাবকের ইচ্ছা পূরণের জন্যই কোন ছাত্র একটি বিষয়ে লেখা পড়া করেছে বা কোন একটি পেশা অবলম্বন করেছে। জনশক্তির এই অপচয় রোধ করার জন্য ছাত্র ও তার মাতাপিতা কে তার প্রতিভা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং যে পেশার মাধ্যমে তার প্রতিভা কার্যে নিয়োজিত করা সম্ভব সেদিকে তাকে পরিচালিত করা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা এবং প্রবণতা শুধু নির্ধারণ ও পরিমাপ করলে চলবে না, তাদের প্রতিভা, প্রবণতা এবং আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা ও থাকতে হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে ভিবিন্ন বৃত্তিমূলক এবং এন্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। এখানে এটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলাফলের সঙ্গে উৎপাদনী শ্রমের ও সমাজ সেবার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশ্বের সকল জাতিই আজ সর্বাপেক্ষা উচ্চমানের প্রতিভা আবিষ্কারের এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষদানের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত জাতিসমূহও এর থেকে বাদ পড়েনি। এই বিশ্বব্যাপী জরুরী তাগিদের পশ্চাতে রয়েছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও যন্ত্রভিত্তিক জীবনধারা। দ্রুত পরিবর্তন এবং তীব্র প্রতিযোগিতাই এ যুগের ধর্ম। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন , উৎসাহী এবং যুগধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার মত সক্ষম লোকের প্রয়োজন হয়তো এর পূর্বে কখনও এত অধিক অনুভূত হয়নি। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে অক্ষম

Dhaka University Institutional Repository

হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিই শ্লথ হয়ে আসবে। এ জন্যই প্রতিভার অনুসন্ধানের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই একই কারণে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোও উপযুক্ত লোকেদের খুঁজে বের করবার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং তাদের প্রতিভাকে জাতীয় উন্নয়নের কাজে লাগাবার জন্য যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশে এই প্রতিভার আবিষ্কার এবং প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা ইতিহাসের এমন এক যুগ সন্ধিক্ষনে জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছি যখন বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন বহু কর্মীর প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব দুরীকরণের জন্য এসব বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন, সেই অভাবই আবার এদের প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষাদানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা বলা যায় যে, যেহেতু একটি শিল্পোন্নত দেশের ন্যায় উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নেই, সেই কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন তার ব্যয়ভার আমরা বহন করতে অক্ষম। এ সমস্যার একটি সমাধান আছে এবং তা হচ্ছে আমাদের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার। পৃথিবীতে বর্তমানে এমন বহু দেশ রয়েছে যারা কাঁচা মালের অভাব সত্ত্বেও তাদের জনশক্তির সদ্ব্যবহারের ফলে উন্নতশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য দেশের সম্পদই শিল্পোন্নত সমাজের মূল উপকরণ। আমাদের সেই সম্পদের প্রাচুর্য্য সম্পর্কে এখনও সঠিক হিসাব আমরা না পেতে পারি কিন্তু আমাদের দেশে বার কোটি লোক রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এই জনশক্তি দেশের জন্য যেমন মূল্যবান হবে তেমনি হবে অক্ষয়। বিশেষ করে যাদের মেধা ও প্রতিভা উচ্চমানের তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষাদান ও ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে মাধ্যমিক স্তর থেকে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ স্বল্প থাকবে, ততদিন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছাত্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর হবে। এর ফলে দেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত দক্ষ লোকের অভাব দেখা দিবে। সুতরাং যে সকল প্রতিভাবান ছাত্রের দ্বারা দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধিত হতে পারে, তাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে বহু

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক বৃত্তিদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরূপ বৃত্তিদানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার একটা অর্থপূর্ণ সমতাবিধান করতে সক্ষম হব।

আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক প্রতিভাবান যুবক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের কর্মক্ষমতা অনুধাবন করার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে যাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে লাভবান হবার ক্ষমতা বা স্পৃহা নেই। এভাবে আমাদের জনশক্তির অপচয় ঘটতে কিংবা আমাদের সীমাবদ্ধ শিক্ষা বিষয়ক সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার হতে দেওয়া অনুচিত। প্রতিভাবান ছাত্রদের অধিকাংশের পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হচ্ছে অর্থাভাব। আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দারিদ্র্যকে প্রতিভার পথে অন্তরায় হতে অথবা দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া উচিত নয়। ছাত্রদের বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সমতাবিধানের যে সুপারিশ করছি তার ফলে যোগ্য ছাত্রদের খুঁজে বের করা এবং তাদের ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হবে। স্কুল , কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়, পর্যায়ে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করার এবং সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সরকারকে মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান যাতে উচ্চতর বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বহু দরিদ্র ছাত্রের বেতন মওকুফ করা হয়। স সাধারণতঃ শতকরা দশজন ছাত্রের পূর্ণ বেতন এবং সমসংখ্যক ছাত্রের অর্ধেক বেতন মওকুফ বর্তমান রীতি। কলেজ গুলোতে ও কনসেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুযোগ-সুবিধা দান অব্যাহত রাখতে হবে। তবে বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ততার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তির পরিমান এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থী কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে পড়াশুনা করতে পারে। গুণাগুণ বিচারই হবে বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচনার বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন, সাধারণ ছাত্রদের বৃত্তি, যাতে তারা বেতন, ছাত্রাবাসের আহার, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে পারে ইত্যাদি।

বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে ও পেশায় প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রবেশের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনা গুলো কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিয়োগের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মূল্যায়নের সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। যেমন, যখন বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অধিক হয়, তখন ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে চাহিদা কম, সেখানে বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। প্রতিভাবান ছাত্রদের খুঁজে বের করার জন্য এবং তাদের উৎসাহিত করার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিভা বিভিন্নমুখী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় কেবল- তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ভুল করা হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা প্রকারের কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির প্রয়োজন। যে সকল ছাত্রের এদিকে ঝোক আছে, তাদের ভাবী কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি গড়ে তুলবার জন্য সুযোগ দিতে হবে। এই ধরনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে হলে প্রত্যেকের সুপ্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং পরিমাপ করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ নির্বিশেষে সকল প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী যেন বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের সমকক্ষ শিক্ষালাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেনিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তান সন্ততি যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ যে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শিক্ষাকে সমাজমুখী করার সমস্যা। দেশময় সাধারণ মানুষের যে সমাজ আর যে সমাজের অঙ্গীভূত যে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন কে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ হলেই সেটা সম্ভব। জাতীয়করণের অর্থ দাঁড়াবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারী কর্তৃত্বের আওতায় রাখা, শহর গ্রাম সব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান যথাসম্ভব সমপর্যায়ে আনা, যোগ্যতা , অভিজ্ঞতা ও কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারে সমতা বিধান করা। এ কাজ ব্যয় বহুল তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ, যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদির যোগান দেবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশ বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোতে এবং বেসরকারী কলেজ গুলোতে ছাত্র বেতন থেকে যে অর্থ আসে তার সাথে সরকারী অর্থ সাহায্য যোগ করে মোটামুটি সব টাকা শিক্ষকদের বেতন দিতে ব্যয় হয়। জাতীয়করণ করলে সব শিক্ষকদের বেতন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ে আনতে হবে। কাজেই সমস্ত স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার ফলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারের প্রতি বছরে পৌনঃ পুনিক ব্যয় বহু পরিমাণে বেড়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষক, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। বিশেষ করে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষাগৃহ, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান। অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় শিক্ষকের বেতন কম। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষকের বেতন কম। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষাদানের মানের উন্নয়নের জন্য যোগ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। আর্থিক অভাবের দরুন অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত গৃহ, শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্রের অভাব খুবই প্রকট। খেলাধূলার জন্য কোন মাঠ বা স্থান নেই, বাসস্থান ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নেই। জাতীয় শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ ও শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র ও খেলাধূলার স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষোপকরণের যে অভাব এবং বহুক্ষেত্রে যে সব শিক্ষোপকরণ রয়েছে তা যে নিম্নমানের তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। জাতীয় শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নতমানের এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তদুপরি যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই যতদিন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভৌগোলক অবস্থান ও জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে এবং জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াবার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। বরং পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পেশাগত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদনী পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে দ্রুত হারে শিক্ষাবিস্তার অতীব প্রয়োজন।

সমাজের কল্যাণের স্বার্থে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং প্রয়োজনমত বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। যে সকল কর্মজীবী ইতিপূর্বে যথাযথ আনুষ্ঠানিক

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাদের প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে জন্য বিভিন্নমুখী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে মিশনারী, বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একই পাঠ্যসূচী অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এইসব বিদ্যালয়ের মান, পরিচালনা ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত সামঞ্জস্যের অভাবে সমাজে শ্রেণীভেদ তীব্রতর হয়েছে। যাতে বৈষম্যাদি দূর করা যায় তার জন্য আমরা মনে করি যে এসব বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলী, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের চাকরির শর্তাদি, শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা, পাঠ্যসূচী, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি প্রশ্নে সরকারী নিয়ন্ত্রণে একই নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে।

বলাবাহুল্য, বহুকালের শোষণ ভিত্তিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাতে উপরের সব গুলো কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে সময়ের প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ণয় করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে যাতে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও এসকাপ রিপোর্ট ১৯৯০ ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

সম্প্রতি ১৯৬০ সাল থেকে পরিচালিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর করার ব্যাপারে ২০ বছরের অধিক সময়ে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো কতটুকু এগিয়েছে সে সংক্রান্ত একটি প্রকাশিত জরিপে বলা হয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি সত্ত্বেও বহু দেশই নির্ধারিত সময়ের মাঝে

---

১ বাংলাদেশ কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কুদরাত-এ -খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ২৫৬ -২৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এ সময় সীমা ছিল ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এ সময়ের মাঝে এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাত বছর বা তারও বেশী সময়ের জন্য একটি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিৎ ছিল। কিন্তু কার্যত এসকাপের মতে ১৯৯৫ সালের আগে কোন দেশ এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। এ পরিকল্পনা পূর্ণ করার পথে দুটো প্রধান বাধা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে এসব এলাকার দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত ঃ সাধারণ শিক্ষাও বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত উৎস না থাকা।

এসকাপের জরীপে আরো বলা হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো যে দুটি সমস্যা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তালিকাভুক্তি মেয়েদের সংখ্যার স্বল্পতা ও প্রথম দু'বছরের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ করা। অবশ্য স্কুল ত্যাগ করার বিভিন্ন কারণ ও রয়েছে। কিন্তু এর ফলে দরিদ্র পরিবার গুলোই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আন্তঃদেশীয় তুলনামূলক জরীপে দেখা গেছে যে, এরকম স্কুল ত্যাগ করার হার দরিদ্র দেশগুলোতেই বেশী। এর ফলে যেমন সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি অত্র অঞ্চলের প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান ও ব্যহত হচ্ছে। অথচ আই, ডি, এ সাহায্যপুষ্ট "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন" প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হচ্ছে;

১) ১৯৯০ সাল নাগাদ ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭০% এ উন্নীত করা ।

২) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে ৫ বৎসর শিক্ষা সমাপ্ত নিশ্চিত করা।

৩) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়ন।

৪) স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

৫) ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার মান উন্নয়ন পূর্বক শিক্ষাদান কর্মে অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।[২]

---

২ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৮৯-৯০ , পৃঃ ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বলাই বাহুল্য যে, ১৯৬০ সালে এসকাপের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী নিয়ে জরিপ শুরু হলেও বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়ুব সরকার ১০ বছরের মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা দিয়াছিলেন।

ধারণা করা হয়েছিল, হয়তো কড়া মার্শাল ল' এর মধ্যে এটা বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানীরা চলে গেলো, নানা ঘটনা ঘটলো, কিন্তু শিক্ষা কিছুতেই সার্বজনীন হলো না। বরং শিক্ষার হার যা ছিল তাই রয়ে গেল। তার পর ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন দেশে ১৯৯৪ এ আবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষণা দয়া হলো ১৯৮৩ সালের মধ্যেই প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন করা হবে। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এ সরকার অবশ্য ক্ষমতায় থাকতে পারেননি । এর মাঝে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে অনেক। কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গতানুগতি কতার ক্ষেত্রে আসেনি কোন পরিবর্তন। আবার ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। শ্রমজীবী শিশু যারা দুঃস্থ ও ভাগ্যহতা, যারা শহরের রাজপথে কিংবা পথে ঘাটে ইটভাঙ্গে, কাগজ কুঁড়ায় কিংবা ঠেলাওয়ালার মতো কঠিন কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের শিক্ষায় আলোকিত করার লক্ষ্যে ১০ই জুলাই ১৯৮৯ ঢাকার ধোলাইপাড়ে উদ্বোধন করেন প্রথম পথকলি স্কুল। শুধু তাই নয়, রওশন এরশাদকে সভাপতি করে পথকলি ট্রাষ্ট ও গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। সম্প্রতি আরো ক'টি স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজের উচ্চ বিত্তদের অনেকেই তাদের কালো টাকা সাদা করার কৌশল হিসেবে পথকলি ট্রাষ্টে অর্থ দিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়।। এটা সত্যি যে এরশাদের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রশ্ন উঠেছে এর পেছনের উদ্দেশ্য এবং আগামী বাস্তবতা নিয়ে। কেননা কোন উদ্যেগেই দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়িত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা তথা সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়নের উদ্যোগকে এড়িয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে গুটি কতক বিশেষ স্থানে নামে মাত্র স্কুল গড়ে তোলে আর যাই হোক শিক্ষার উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। তাই বরং প্রয়োজন সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়ানো বা "শাক দিয়ে মাছ ঢাকার" কৌশল পরিহার করে সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তব সম্মত ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কঠোর প্রয়াস। অথচ এ ব্যাপারে সরকারের কোন মাথা ব্যাথা আছে বলে মনে হয় না। উপরন্ত উল্টো একের পর এক বৈপ্লবিক ঘোষণা দিয়েই যাচ্ছেন। যেমন, গত ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে এরশাদ তাঁর এক বক্তৃতায় ১৯৯০ কে "বালিকা বর্ষ" হিসেবেও ঘোষণা দিয়ে পৌর সভার বাইরের স্কুল গুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখনও এর কিছুই কার্যকর হয়নি।

এমনিভাবে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সকল উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিংবা আন্তরিকতা, উদ্যোগহীনতা আর সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আকাঙ্খার কারণে সফলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি। অবশ্য এর সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত রয়েছে রাষ্ট্রের চরিত্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোর বিষয় সমূহ। তবে সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, একটি অনুন্নত পরনির্ভরশীল অর্থনীতি সম্পন্ন দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এর প্রয়োজনের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল এবং তা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে মূল বরাদ্দ ও প্রকৃত বরাদ্দের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ১০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ শতকরা ১৭ ভাগ থেকে নেমে ১২ ভাগ এসেছে। পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে।[৩]

---

৩ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাঃ সমস্যা ও স্বরূপ, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাঃ সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণাও বাস্তবতা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং নোট বই নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন হস্তান্তর উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী- এ, এস, এইচ, কে, সাদেক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ইকবাল সোবহান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৭ মাসের ব্যবধানে শিক্ষানীতির এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট রিপোর্ট পেশ করার কথা থাকলেও প্রধানমন্ত্রী বিদেশে থাকার কারণে শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট পেশ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক বলেন, ১৯টি সাব কমিটিতে দেশের ১৩১ জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দাখিল করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেদনে ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। মাষ্টার্স কোর্স হইবে ১ বছরের। ইহার পর এম, ফিল ও পি, এইচ, ডি ডিগ্রী করা যাবে।

শিক্ষানীতিতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে এই ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় কারিগরি শিক্ষাকে জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। প্রথম শ্রেণীতে শুরুর ৬ মাসকে শিশু শ্রেণী বলে গন্য করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্ডার গার্টেন প্রচলিত শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লেখাপড়া করানো যাবে না। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নম্বর বন্টন পদ্ধতি হবে রচনামূলক ৩০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ৩০ নম্বর এবং

Dhaka University Institutional Repository

নৈব্যক্তিক প্রশ্নমালা ২০ নম্বর। অবশিষ্ট ২০ ভাগ থাকবে শিক্ষকের হাতে। শিক্ষক ছাত্র- ছাত্রীরা মেধা, ক্লাশে হাজিরা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের উপর এই ২০ নম্বর প্রদান করবেন। এই নম্বর বন্টন প্রক্রিয়া চালু হবে ৬ষ্ট শ্রেণী হইতে। ২ হাজার ১০ সালের মধ্যে এই শিক্ষানীতি যাহাতে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ,এস, এইচ, কে সাদেক বলেন, শিক্ষানীতির প্রতিবেদন মানেই চূড়ান্ত কিছু নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষামন্ত্রী এ,এস, এইচ, কে, সাদেক বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন কমিটি। কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন কে ভিত্তি করে এইকমিটি বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন পেশ করেছেন।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যেহেতু গ্রামের ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী সেহেতু তাদের মন মানসিকতা, আর্থিক সামর্থ্য ও পল্লীর অগ্রগতির ধারাকে সামনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে যে নানা পাঠ্যসূচী সমন্বিত সুযোগ সুবিধার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে করে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরনেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেননা কিন্ডার গার্টেন, টিউটোরিয়াল হোম, ক্যাডেট কলেজ, ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইত্যাদিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের মাঝে মিলতো নেই বরং ব্যবধান রয়েছে বিস্তর, যেখানে কাজ করছে অর্থ । অর্থাৎ এক্ষেত্রে Hundred percent depends on money অর্থই এক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য এটাই মোটেই কাম্য নয়। তাই আগামী দিনে দেশকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য সকলের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারসহ সংশ্লিষ্ঠ প্রশাসনকে আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

---

৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ, ১-৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকা শহরের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো

৪.১ ঢাকা শহরের ঐতিহাসিক পটভূমি

দেশের ইতিহাস হচ্ছে জাতীয় জীবন গড়ার প্রধান উপায়। স্বদেশ- প্রাণ কতিপয় মনীষী সাহিত্য সেবী বাংলার অনেক জেলার ইতিহাস লিখে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু ঢাকার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস নেই, যে স্থান বহু পন্ডিত মন্ডলী ও বিদ্বৎজন সেবিত হয়ে একদিন ভারতের মধ্যমনি রূপে গণ্য হতো, যে স্থানের প্রতি ধূলিকণার সাথে অসংখ্য হিন্দু- মুসলিম সাধক, পীর ও মহাপুরুষের প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে, যে স্থান সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলার রাজধানী বলে পরিগণিত ছিল। যে স্থানের ভাষার আদর্শে বাংলাভাষা গঠিত হয়েছে, সে স্থানের বিস্তৃত বিবরণ জানবার আগ্রহ কার না হয় ? টেভার্ণিয়ার আমির- উল- ওমরা নবাব শায়েস্তাখাঁর প্রথম সুবাদারী প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হলেও পূর্বের সুবাদারগণ মগ ও পর্তুগীজ দস্যু এবং প্রত্যেক প্রদেশের রাজন্যবর্গের সাথে সর্বদা যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকায় রাজধানীর উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করতে পারেননি। কিন্তু তখনও নবাব ইসলাম খাঁর 'প্রাচীন দুর্গ' সা সুজার আদেশে আবুল কাশেম কর্তৃক "ছোট কাটরা", মীর মোরাদের "হুসনীদালান" "মকিমের কাটরা", "ইদগা", মহারাজ বল্লালের প্রস্তুত "ঢাকেশ্বরীর মন্দির" প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্ম্য রাজি, স্থাপত্য কৌশলে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স সিয়ার ম্যান বার্ড, ক্রিম্প, জন ফেন্ডেল, জেমস গ্রেহাম প্রভৃতি মনীষীগণ ঢাকার বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপাদি সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। "Respecting the city of Dacca we must observe, that it has had more than one period of decay. During the reign of the Emperor Aulumgeer, its splendour was at the height; and judging from

Dhaka University Institutional Repository

the magnificence of many of the ruins, both in the heart of the present city and its environs such as bridges, brick cause- ways, mosques, seraisgates, palaces and gardens, most of them, least in the environs, now overgrown with wood, it must have vied in extent and riches with any of the great cities we know of in Bengal, not perhaps excepting Gour."[১]

বিশপ হিবার ঢাকা শহরকে মস্কোনগরীর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি পুস্তাপ্রাসাদ সন্দর্শন করে লিখেছেন যে, "The architecture is precisely that of the kremlin of Moscow of which city, indeed, I was repeatedly reminded in my progress through the town."[২]

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রামপালের অধঃপতন সংঘটিত হলে সোনার গাঁয়ের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং মুসলমানগণ কর্তৃক লিখিত ইতিহাসে উহা গৌরবের সাথে উল্লেখিত হতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বারণি সর্ব প্রথম সোনারগাঁয়ের উল্লেখ করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সোনার গাঁয়ে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই সোনারগাঁয়ে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হতে থাকে এবং সোনারগাঁ পূর্ব বঙ্গের রাজধানী বলে বিবেচিত হয়। এ সময়েই সোনার গাঁয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সোনার গাঁয়ে অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মসলিন বস্ত্র সভ্য জগতের বিস্ময়ের উৎপাদন করে সোনার গাঁকে সুপরিচিত করে। সোনার গাঁয়ের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারত বর্ষের নানা স্থানের ন্যায়- সিংহল, পেগু, চীন, যাবা, মলক্কস, সুমাত্রা প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশে এমন কি সুদূর ইউরোপে পর্যাপ্ত রপ্তানী হত। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ সুদূর আরব ও ইউরোপ হতে ভারতে এসে, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করে ও

---

১ শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথমখন্ড, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা

২ প্রাগুক্ত, ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সোনারগাঁর সমৃদ্ধি গৌরব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজনীয় বোধ করতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক সমগ্র বাংলা সোনার গাঁর আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সোনার গাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা দিল্লীশ্বরের অধীনতা পাশ ছিন্নকরত; স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং প্রায় দ্বিশতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

খৃীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ঢাকার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে মোগল সম্রাটের সেনানিবাস স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সাথে ঢাকা বাংলার রাজধানীতে পরিগণিত হয় । তখন থেকে শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সাথে সোনারগাঁর সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। রাজধানী স্থাপনের পর থেকে ঢাকার রাজ-প্রাসাদ হতে সমগ্র বাংলাদেশ শাসিত হত। ঢাকার সুদৃঢ় দুর্গ হতে রণ -দুর্ম্মদ মোঘল অনিকিনী বহির্গত হয়ে আসাম, বিহার, চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে দিল্লীশ্বরের শাসন-প্রভাব বিস্তার করত।

এই সময়ে ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ১৫,৩৯৭ বর্গ মাইল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কালেক্টরী হতে পৃথক হয়ে যায়। ১৮১১ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর এবং ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দ্বয় ঢাকা বিভাগ হতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা জেলাকে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৮৮০ খৃঃঅব্দে ত্রিপুরা ও ঢাকা বিভাগহতে পরিত্যক্ত হয়েছে।

ইংরেজ শাসনামলে সন্ন্যাসী- বিদ্রোহ ও সিপাহী- বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন অন্তর্বিপ্লব এখানে সংঘটিত হয়নি। ১৯০৫ সনে সুশাসনের স্বার্থে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করে ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাপিত হয়। কিন্তু সমগ্র বঙ্গ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে সহৃদয় ভারত- সম্রাট ভারতবর্ষে শুভাগমন করে বঙ্গবিচ্ছেদ রদ করেন। ফলে ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী পুনরায় বিলুপ্ত হয়।

সারণী ঃ ৪.১

Decennial population of Dhaka city (in round figures) (1872-1941)

↓

Year	Population	Area (Sq. miles)	Year	population (sq. miles)	Area
1872	69,000	6.00	1911	126,000	10.00
1881	80,000	8.00	1921	138,00	12.00
1891	83,000	8.00	1931	162,000	12.00
1901	104,000	10.00	1941	240,000	12.00

Source : UNCHS (1980)

১৯৪৭ সালে ভারত- পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়। যে সব এলাকায় বেশী হিন্দু বসবাস করত সেসব অঞ্চলকে নিয়ে ভারত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট- অঞ্চলকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। মোগল শাসনের সময় ঢাকা শহরে হিন্দুর চেয়ে মুসলিম জনসাধারণ বেশি ছিল। আবার ব্রিটিশ শাসনের সময় ঢাকা শহরে হিন্দু জনসংখ্যা বেশী ছিল। পাকিস্তানের ২৫ বৎসরের শাসনাধীনে ঢাকা শহরের লোক সংখ্যার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত লোক সমাগম ঘটে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ঢাকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নূতন রাজধানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমান শতাব্দীতে পুরাতন ঢাকার বিবিন্ন অংশে উত্তরোত্তর দালান- কোঠা নির্মিত হচ্ছে এবং শহরের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার পর নূতন নূতন

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী অফিস আদালত এবং সরকারী কোয়াটার ও বাড়ীঘর দ্রুত গতিতে নির্মিত হয়েছিল। শহরে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে আজিমপুর, নিউমার্কেট নিউ ইস্কাটন, পুরানাপল্টন এবং কমলাপুর এলাকায়।

১৯৫৩ সালে ধানমন্ডি এলাকা এবং ১৯৬০ সালের দিকে মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও এবং গুলশান এলাকায় উন্নয়ন সংগঠিত হয়। ঠিক এই সময় টঙ্গী, ঘোড়াশাল এবং নারায়ণগঞ্জের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। বিশেষ করে সার, পাট শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প, খাদ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ষাটের দশকের দিকে ঢাকা শহর পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী বলে বিবেচিত হত। তখন শেরে-ই-বাংলা নগরে সরকারী যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদিত হত। শিল্প ও বাণিজ্যক চাহিদার কারণে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর ভাঙ্গনের আশংকায় নারায়ণগঞ্জে বন্দর গড়ে উঠে। কিন্তু বর্তমানে অনুন্নত এলাকা বলতে টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জকে বোঝানো হয়। আবার ঢাকা ও সাভারের মধ্যবর্তী এলাকায় এখনো পর্যাপ্ত জায়গা উন্মুক্ত রয়েছে।

৪.২ ঢাকা শহরের অধিবাসী ও ভৌগোলিক পরিবেশ

ঢাকা শহর মূলত বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ঢাকা শহর বলতে আমরা ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (DMC) নিয়ন্ত্রাধীন এলাকে বুঝব। ঢাকা শহর উত্তর নিরক্ষ ২৩°-৪৩'-২০" এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৯০°-২৬'-১০" মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান থেকে ৮ মাইল উত্তর এবং কলিকাতা থেকে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ঢাকা বংলাদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। এটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কেন্দ্র ও বটে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ঢাকা শহরের আয়তন (DMC) ১৩৫৩ বর্গ কিলোমিটার। ঢাকা শহরের মোট লোকসংখ্যা ৬৮,৪৪১১৩ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা হল ১,১৭৪,২৭২ টি। ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০৫৮ জন। বর্তমানে ঢাকা শহরে ৯০ টি ওয়ার্ড রয়েছে। প্রায় ৮৬ টি মৌজা (Mouzas) রয়েছে। তাছাড়া,

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরোত্তর ঢাকা শহরের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিনের পর দিন অপরিকল্পিত নগর গড়ে উঠছে, যাকে উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞানে অতিনগরায়ন (Over urbanization) বলা হয়ে থাকে। অতি সাম্প্রতিক কালে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রীজ নির্মিত হওয়ায় বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীরে ও নগর গড়ে উঠছে। ঢাকা শহর মূলত পাকারাস্তা, রেলওয়ে, নদী, এবং অভ্যন্তরীন বিমান যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের সব জেলার সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া, ঢাকা শহরের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ও রয়েছে।[৩]

৪.৩ ঢাকা শহরের ভূ-সম্পত্তির মালিকানার ধরন

ঢাকা শহরের উন্নয়ন ও চারদিকে ঘেরাও দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমি চরম সংকট সৃষ্টি করে থাকে। ঢাকা শহরের পশ্চিম এবং দক্ষিণ সীমানা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। এবং পূর্বদিকে বালু নদীর পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে থাকে। উভয় এলাকা বছরের চার (৪) মাস বন্যার পানি দ্বারা ভর্তি থাকে। পানির উচ্চতা প্রায় ১.৫ ফুট থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কখনো কখনো অতিরিক্ত বন্যা বা পাহাড়ী ঢলের কারণে ঢাকা শহরের ৬০% থেকে ৭০% এলাকা বন্যা কবলিত হয়। যে সব এলাকা সচারাচর বন্যার পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় না সে সব এলাকায় বসতবাড়ী , কলকারখানা, অফিস আদালত, দোকান পাট গড়ে উঠেছে। ১৯৮২ সালের এক জরিপে দেখা গিয়েছে যে ঢাকা শহরে এক লক্ষ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হোল্ডিং রয়েছে। তাছাড়া ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী হোল্ডিং (holding) রয়েছে। যার সঠিক সংখ্যা এখন পর্যন্ত সরকারের ও অজানা রয়েছে। এসকল হোল্ডিংয়ের গড় আয়তন হলো ০.১৩২৪ একর বা ৮ কাঠা। ঢাকা শহরে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে শতকরা ৬০ ভাগ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শতকরা ৩৬ ভাগ এবং উপহার ও অন্যান্য খাত থেকে শতকরা ৪ ভাগ জমি অর্জিত হয়। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা ব্যক্তিগত খাতসমূহ থেকে আসে।

---

৩ Bangladesh Bureau of Statistics : 1993, PP. 1-5

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ী নিজ খরচে নির্মিত হয়ে থাকে। শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ী হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের খরছে নির্মিত হয়। শতকরা ১৩ ভাগ বাড়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বারা নির্মিত হয় এবং বাকী ১২ ভাগ বাড়ী অন্যান্য উৎসের অর্থ দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে।[৪]

এক জরিপের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ঢাকা শহরের ভূমি মালিকানার ধরন নিম্নে দেখানো হলো ঃ

সারণী ঃ ৪.২

ঢাকা শহরের ভূমি মালিকানার ধরন

↓

উপার্জনক্ষম- গোষ্ঠী	জনসংখ্যার শতকরা হার	ভূমি মালিকানার শতকরা হার
উচ্চ শ্রেণী	২	১৫
উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী	২৮	৬৫
মধ্যবিত্ত শ্রেণী	৩০	২০
নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী	৪০	০
সর্বমোট	১০০	১০০

Source : NAZRUL ISLAM (1986)

ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান হারে একটি শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাছাড়া হাউজিং সোসাইটির নামে ব্যক্তিগত ভাবে জমি অর্জনের কৌশলও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় বর্তমানে ৭০ টি হাউজিং সোসাইটি রয়েছে। তার মধ্যে ১৫ টি ঢাকা শহরে এবং ৪৫ টি সাভারে কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এই হাউজিং সোসাইটি গুলো জমির ১০,০০০ একর সিলিং মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আবার পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৩৩.৩ একরের বেশী হওয়ার বিধান নেই। কিন্তু সমগ্র ঢাকা শহরে কেবলমাত্র একটি হাউজিং সোসাইটির নামেই ৩,০০০ একর জমি রয়েছে।

---

৪ Kamal Siddiqui and etal; social formation in Dhaka city , PP. 22-23

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহরে দুই ধরনের সরকারী খাস (Khas) জমি রয়েছে। কিছু জমি নিষ্পত্তির উপযুক্ত এবং কিছু জমি নিষ্পত্তির উপযুক্ত নয়। শেষোক্ত ধরনের জমির মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, নদীনালা, বনভূমি, জনসাধারণের সুবিধার্থে পার্ক, ইত্যাদি। ঢাকা শহরে বর্তমানে বসবাসযোগ্য খাস জমির পমিরমাণ হলো- ৬৭১ একর। ঢাকা শহরে সমপরিমাণ খাস জমি আবার জাল দলিল- পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল করে ভোগ করছে। শহরে বর্তমানে বসবাসের যোগ্য কি পরিমান সরকারী খাস জমি রয়েছে তার সঠিক কোন হিসেব নিকাশ নেই। তাছাড়া ঢাকা শহরে অন্য এক ধরনের সরকারী জমি ও রয়েছে, যা মূলত বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। এক জরিপে দেখা গিয়েছে যে, এ ধরনের জমির দুই-তৃতীয়াংশ খালি অথবা ব্যবহারধীন রয়েছে।

সারণী- ৪.৩

ঢাকা শহরে ব্যক্তিগত ভূমি ব্যবহারের ধরন

↓

ব্যবহারের ধরন	ব্যক্তিগত হল্ডিংয়ের শতকরা হার
আবাস স্থল	৮৭.৬৪
দোকান	৪.৯১
অফিস	১.২১
ফ্যাক্টরী	১.৮৯
খালি	১.১৯
অন্যান্য	৩.১৬
মোট ব্যবহার	১০০.০০

Source : Kamal Siddiqui and etal ; social formation in Dhaka City, 1990, P,24

প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ জমি গৌণ কাজে ব্যবহৃত হচেছ। যেমন ঃ- দোকান, ফ্যাক্টরী এবং অন্যান্য কাজে। মুখ্য ও গৌণ কাজে ব্যবহৃত জমির মধ্যে দোকান এবং শপিং কমপ্লেক্সের কাজে ব্যবহার বেশী। এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান কারণ হচ্ছে; ক) বসত বাড়ীর চেয়ে দোকান পাটের ভূ-রাজস্ব কর এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর অনেক বেশী। ঢাকা শহরে বেশীর ভাগ সরকারী জমি আবাসিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া পার্ক, সরকারী অফিস, এবং অন্যান্য কাজে লাগছে।

উপরোক্ত সারণীতে ঢাকা শহরের জমি ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। উক্ত সারণীতে মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহারের ধরনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে তহসিল অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশন এর জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণের উল্লেখ নেই।

সারণী ঃ ৪.৪
এলাকা ভিত্তিক ঢাকা শহরের ব্যক্তিগত জমির ব্যবহারের ধরন

থানা বা তহসিলের নাম	শিল্প/ বাণিজ্যে ব্যবহৃত ভূমি	আবাসিক ভূমি	কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি	মোট (একরে)
গুলশান	৩২.০০	২৫১৩.০০	১৬৩৭৮.০০	১৮৯২৩.০০
তেজগাঁও	২৬০.০০	৫৪২.০০	২৯.০০	৮৩১.০০
মোহাম্মদপুর	২৬.০০	৭৩৮.০০	১২৬৭.০০	২০৩১.০০
মিরপুর	২৫৮.০০	১৬৯৬.০০	৯২৪২.০০	১১১৯৬.০০
ডেমরা	২৫৯.০০	২৪০৫.০০	১০৪৬২.০০	১৩১২৬.০০
লালবাগ	৩২০.০০	৯২৯.০০	-	১২৪৯.০০
সূত্রাপুর	২০৮.০০	৪৮৬.০০	-	৬৯৪.০০
মতিঝিল	৫২.০০	৭৭৭.০০	-	৮২৯.০০
কোতোয়ালী	১০৭.০০	১৭১.০০	-	২৭৮.০০
ধানমন্ডী	২৫৪.০০	১১৫৩.০০	-	১৪০৭.০০
রমনা	৩২.০০	৬৩৬.০০	-	৬৬৮.০০
মোট	১৮০৮.০০ (৩.৫%)	১২০৪৬.০০ (২৩.৫%)	৩৭৩৮৮.০০ (৭৩%)	৫১২৪২.০০

Kamal Siddiqui and etal; opcit, P. 25

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণীতে লক্ষ্য করা যায় যে ঃ

প্রথমত ঃ ঢাকা শহরের মোট জমির প্রায়, শতকরা এক চতুর্থাংশ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শতকরা ৩.৫ ভাগ জমি শিল্পে এবং বাকী শতকরা ৭৩ ভাগ জমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কৃষি জমি মূলত গুলশান, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ডেমরা এবং তেজগাঁও এলাকায় দেখা যায়। উপরোক্ত সারণীতে শিল্প এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত জমিকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। ১৯৮৯ সালের এক জরিপে লক্ষ্য করা যায় যে, শতকরা ৭৫ ভাগ জমি শিল্প ও বানিজ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে ২৫ ভাগ জমি শিল্পের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। গুলশান, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ডেমরা এবং তেজগাঁও থানার অনেক জমি প্রতি বৎসর কৃষি থেকে আবাসিক অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ঢাকা শহরের ভূমি ব্যবহারের ধরন নিম্নে প্রদান করা হলো;

ক) জমি কৃষি কাজের জন্য দলিলপত্রে রেকর্ডকৃত থাকলেও উত্তরোত্তর কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যদিও কৃষি জমিতে করের (tax) পরিমান খুবই কম।

খ) আবাসিক কাজে ব্যবহৃত জমির মূল্য কৃষি জমির চেয়ে অনেক বেশী। আবার কৃষি ও আবাসিক জমির চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত জমির মূল্য অনেক বেশি।

গ) শিল্পকারখানা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে তা ব্যবসা- বাণিজ্যে নিয়োজিত জমির পরিমাণের চেয়ে কোন অংশে বেশী নহে। সমগ্র- ঢাকা শহরে কৃষি জমিতে ব্যাপকহারে ইট তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছে। পরিণামে উর্বর জমি এবং ঢাকা শহরের আবহাওয়া উত্তরোত্তর দূষিত হয়ে পড়ছে।

জমি ক্রয় করবার চাহিদা মানুষের নিকট যুগে যগে লক্ষ্য করা গিয়েছে। জমি কেবলমাত্র আশ্রয়, রাস্তাঘাট, শপিং কমপ্লেক্স, শিল্প কারখানা এবং জনসাধারণের সুবিধার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে না বরং এটি শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ এই ১০ বৎসরে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি মানুষের জীবন ধারণের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে ক্রমান্বয়ে বসতবাড়ী শিল্প কারখানা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা চিকিৎসালয়, সরকারী অফিস আদালতে ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া শহর এলাকার ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে কৃষক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা জমি গুলো অনেক বেশী মূল্যে বিক্রি করে অধিকতর লাভবান হচ্ছে। কারণ কৃষি জমির মূল্য অনেক কম। কিন্তু উঁচু জমি বসত বাড়ীর জন্য চড়া হারে বিক্রি হচ্ছে। ফলে নগরের সম্প্রসারণ ঘটছে।

ঢাকা শহরের জমির মূল্যের ধরন প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন;

(ক) ঢাকা শহরে জমির মূল্য বার্ষিক শতকরা ১২.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.২ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

খ) পুরাতন ঢাকা অপেক্ষা নূতন ঢাকায় জায়গা জমির মূল্য সব সময় বেশী থাকে।

গ) কৃষি জমি অপেক্ষা বসত বাড়ীর জমির মূল্য অনেক বেশি এবং তা অনবরত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ) ঢাকা শহর বাংলাদেশের রাজধানী শহর হওয়ায় এখানে জমির মূল্য পা াত্যের মেট্রোপলিটন শহরের তুলনায় বেশী নয়। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বর্তমানে প্রতি একর জমির মূল্য প্রায় ৩ কোটি বা ৩০ মিলিয়ন টাকা।

ঢাকা শহরের জমির দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

প্রথমত ঃ উৎপাদন ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরৎ আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ায় শহরের ধনী লোকেরা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিকতর লাভবান হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ ঢাকা শহরে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বসত বাড়ী অথবা ব্যবসা- বানিজ্যের জন্য জমির চাহিদা ইহার সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা দুঃখজনক ভাবে ভূমি থেকে কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

চতুর্থত ঃ কতিপয় কোম্পানী ও হাউজিং সোসাাইটি সাম্প্রতিক কালে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। এবং জমির সিলিং মাত্রা ছাড়িয়ে অবৈধ টাকার জোরে ঢাকা শহরের বেশির ভাগ জমি কুক্ষিগত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

ঢাকা শহরে প্রতিবছর পর্যাপ্ত জমি হস্তান্তর হয়ে থাকে। যা বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে দেখা যায় না। মূলত ঢাকা শহরে প্রতি বছর যে জমি হস্তান্তর হয় তা সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ। তাছাড়া ঢাকা শহরে একটি বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে যারা সব সময় জমি কেনা-বেচা করে থাকে। তাছাড়া শহরের মধ্যে দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ও অনবরত জমি কেনা- বেচা হয়ে থাকে। আবার জমি হস্তান্তরের মূল কারণ হলো কৃষি জমি গুলোতে প্রতিনিয়ত বসতবাড়ী , কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।[৫]

মোট কথা, ঢাকা শহরের জমি জমার বন্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত অসম। শহরের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ লোক শতকরা ৮০ ভাগ জমি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া ক্রমাগত দ্রুততর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা শহরের কোনো কোনো এলাকায় জমির দাম ইউরোপ ও আমেরিকার শহরের চেয়ে কোনো ভাবেই কম নয়। শহরে জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবাসিক ভবন ও এলাকা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, শতকরা ৮৮ ভাগ জমি আবাসগৃহ নির্মাণের জন্য অধিকৃত ,এবং শতকরা মাত্র ৫ ভাগ ও ১.৮৯ ভাগ জমি যথাক্রমে দোকানঘর ও কলকারখানার জন্য নির্ধারিত। ঢাকা শহরের খালি জায়গার পরিমাণ হচ্ছে শতকরা মাত্র ১.১৯ ভাগ। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় ঢাকা শহরের আসাসিক ব্যবস্থা অনুভূমিক, উলম্বী ধরনের নয়।[৬]

---

৫ ibid, p. 26

৬ রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, পৃঃ ১২০-১২১

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ ঢাকা শহরের শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো

কামাল সিদ্দিকী ও অন্যান্য কয়েকজন গবেষকদের দ্বারা প্রণীত ঢাকা শহরের সামাজিক কাঠামো তথা স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ভিত্তিক যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাতে রাজধানী শহর ঢাকার সমাজচিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মটি তৃতীয় বিশ্বের শহুরে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ অবদান বলে বিবেচিত হতে পারে। গ্রন্থটিতে রয়েছে ঢাকা শহরের অতীত ইতিহাস, বাস্তভিটার বৈশিষ্ট্য, ধনী ও গরীব জনগোষ্ঠীর অবস্থান, ভিক্ষুক, ছিন্নমূল, পতিতা এবং সামাজিক অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত লোকদের জীবন যাত্রার বিবরণ, আবার ঢাকা শহরের শিক্ষার হার, নারী ও পুরুষ শিক্ষার ব্যবধান, ভাড়াটে ও বাড়ীওয়ালাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের তারতম্য ইত্যাদি ও উক্ত গ্রন্থে চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে নগর জীবনে পরিবর্তন আনয়নকারী সামাজিক শক্তি সমূহের ভূমিকারও উল্লেখ আছে।[৭]

১৯৬১ সালের আদম শুমারী অনুসারে ঢাকা শহরের সব বয়সের নারী-পুরুষের শিক্ষারহার ছিল শতকরা ৩৯.৮ ভাগ। ১৯৮১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৫.৮ ভাগে উপনীত হয়েছে। তবে উপরোক্ত গবেষকগণ ১৯৮৫ সালে ঢাকা শহরে ওয়ার্ড ভিত্তিক জরিপ চালিয়ে দেখেন যে, শিক্ষার হার একটু বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারীতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঢাকা শহরের পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার অনুপাত ৫২. ৮ : ৩৫.৯ অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষার সুযোগের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এটি আশার কথা যে ১৯৬১ এবং ১৯৮১ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা শহরের পুরুষের চেয়ে মহিলা শিক্ষার হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, ঢাকা শহরে পুরুষ শিক্ষার হার ১৯৬১ ও ১৯৮১ যথাক্রমে ৪৮.৪% ও ৫২.৮% ছিল। পক্ষান্তরে, ঠিক একই সময়ে মহিলা শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২৭.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্য যে কোন শহরের তুলনায় ঢাকা শহরে শিক্ষার হার বেশি।

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার (৩২.৪) হারের তুলনায় ইহা অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ সমূহ হচ্ছে;

ক) দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষিত লোকের ঢাকা শহরে অভিবাসন (Immigration)

খ) ঢাকা শহরে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ- সুবিধা রয়েছে। যদিও বিশ্বের অন্যান্য শহরের তুলনায় ঢাকা শহরের শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম।

গ) তাছাড়া হিন্দু (৪১.৭%) ও মুসলিম (৪১.৬%) জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার হারের তেমন কোন পার্থক্য ও দেখা যায় না। সবচেয়ে বেশী শিক্ষার হার খৃষ্টানদের (৬৬.৮%) মধ্যে। এর একটু নীচে হল বৌদ্ধদের (৬৩.৭%) অবস্থান। তবে পুরাতন ঢাকা ও নূতন ঢাকার মধ্যে শিক্ষার হারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণী ঃ ৪.৫

ঢাকা শহরের বসবাসরত পরিবার পরিজন এবং পরিবারের আকৃতি নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো

↓

ঢাকা শহরের পরিবারের সংখ্যা ও আয়তন বা আকৃতি (১৯৫১-৮১)				
পরিবারের বৈশিষ্ট্য	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১
বসবাসরত মোট পরিবারের সংখ্যা	৩৯,৯০৩	৬১,৯৮৩	১৯৭৩৬১	৩৬৭,৫১৩
পরিবারের আকৃতি	৬.৯	৫.৯	৭.১	৬.১

উৎস ঃ Bangladesh Bureau of Statistics (1987)

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১০ বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পরিবারের আয়তন ও বাংলাদেশের জাতীয় গড় আয়তনের (৫.৮%) তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে ঢাকা শহরের অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়ার কথা উল্লেখ্য করা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। ফলশ্রুতিতে একজনের আয়ে পরিবারের আয়তন এক সাথে ভরনপোষন করতে হয় বলে পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজন শিক্ষার বা চাকুরীর জন্য এসে অবস্থান করে বলে পরিবারের আকৃতি বেড়ে যায়।

ঢাকা শহরে শিক্ষার উপর ও ধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানে করা হলো;

সারণী ঃ ৪.৬

ঢাকা শহরে শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক

↓

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মুসলিম পরিবারের শতকরা হার (MHH) N =২৮১২	হিন্দু পরিবারের শতকরা হার (HHH) N =৯২	বৌদ্ধ পরিবারের শতকরা হার (BHH) N =৩৩	খৃষ্টান পরিবারের শতকরা হার (CHH) N =১৬
অশিক্ষিত	১৪.৩	৫.৪	৩.০	৬.৩
অর্ধ শিক্ষিত (১) (I-V)	২০.২	২০.৭	১২.১	৬.৩
অর্ধ শিক্ষিত (২) (VI-X)	১৬.৬	২৩.৯	৩৯.৪	৩১.৩
আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত	৪৮.৪	৫০.০	৪৫.৫	৫৬.৩

Source : social Formation in Dhaka city : p. 57

উপরোক্ত সারণী থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাগত মর্যাদা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। মুসলিম জনগোষ্ঠীর তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশী। খৃষ্ঠান ও বৌদ্ধদের শিক্ষার হার সর্বোচ্চ এবং প্রায় শতকরা ৮০ ভাগের বেশী। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা

Dhaka University Institutional Repository

৭৪ ভাগ এবং তারা দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। অপর দিকে, মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার ৬৫% এবং তারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

সারণী ঃ ৪.৭

ঢাকা শহরে লিঙ্গ (Gender) ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক

↓

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের মহিলা প্রধানদের শতকরা হার (%)	পরিবারের প্রধান হিসেবে পুরুষদের শতকরা হার (%)
অশিক্ষিত	৩১.৬	১৩.১
অধশিক্ষিত (১- x)	৪৬.৮	৩৬.৪
এস, এস, সি	২০.৬	৫০.৫
এইচ, এস, সি	১১.৯	২২.৪
ডিগ্রী , মাষ্টার্স ডিগ্রী এবং সমমান	৮.৭	২৮.১

উৎস ঃ ibid : P. 57

ঢাকা শহরের একজন মহিলা পরিবার প্রধানেরও পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী, মাদ্রাসা শিক্ষা, ডিপ্লোমা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভাক্তারী ডিগ্রী নেই। উপরোক্ত সারণীর মধ্যেই পুরুষ ও মহিলার শিক্ষার তারতম্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। শিক্ষার হারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, মহিলারা তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

জনতাত্ত্বিক ভাবেই ঢাকা অন্যান্য শহরের চেয়ে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন, ঢাকা শহর যুবক-যুবতীর কল-কাকলীতে অধিকতর মুখরিত। কারণ শহরের মোট বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগের বয়স ৪০ এর নিচে এবং শতকরা মাত্র ২৯ ভাগের বয়স ৫০ এর উপর। ঢাকা শহরের অধিকাংশ মানুষই বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালি জেলা থেকে আগত। শহরে পরিবারের গড় আকৃতি ছয় দশমিক সাত সদস্য (৬.৭) বিশিষ্ট, যেখানে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারের কাঠামো গড়ে পাঁচ দশমিক পাঁচ (৫.৫) জন লোক নিয়ে গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহরের ভূমি মালিকদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশই সরাসরি জমি কিনে করায়ত্ত করেছে। এর দ্বরা সম্পত্তিবান শ্রেণীর সুস্পষ্ট সামাজিক গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শতকরা ৩৭ ভাগ লোকের কোনো সম্পত্তি ঢাকা শহরে নেই। শিক্ষার সাথে রয়েছে সম্পত্তি মালিকানার ইতিবাচক সম্পর্ক। যে যত বেশি উচ্চ শিক্ষার অধিকারী তারই সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা তত বেশি। শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ মানুষ আপন বাড়িতে বসবাস করে এবং শতকরা ৪৪ ভাগ ভাড়া বাড়ীতে থাকে । শতকরা ৬৬ ভাগ মানুষ ঢাকা শহরে প্রথম প্রজন্মের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের বাসিন্দাদের হার যথাক্রমে শতকরা ১৭ ও ৮। ভাগ, প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বাসিন্দাদের রয়েছে গ্রামের সাথে যোগাযোগ এবং ৫১ ভাগ মানুষ গ্রামে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। বিনোদনের জন্য ঘরের বইরে যাওয়া শহুরে জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ঢাকা শহরের বেশির ভাগ মানুষ সন্ধ্যার পরে ঘরে বসে সময় কাটায়। অফিস অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ শেষে শতকরা ৬৪ ভাগ মানুষ ঘরে বসে বিনোদন করে এবং মাত্র শতকরা ৬ ভাগ লোক বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। যারা ক্লাব ও অন্যান্য ধরনের বিনোদনের সুসংগঠিত কেন্দ্রে যাতায়াত করে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গৃহ প্রধান ব্যক্তিদের শতকরা ২১ ভাগ কম বেশি রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ধরনের সংগঠনের সাথে যুক্ত । ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা আরেকটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ঢাকা শহরের যানজটের সমস্যা এমনই প্রকট রূপ ধারণ করেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এ শহর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ার আশংকা ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে। যানবাহনের ধরন ও তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শহরবাসীর সামাজিক স্তরবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঢাকা শহরের বেলা এর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। ঢাকা শহরের পরিবার প্রধানদের শতকরা ৭.৬ ভাগ লোক গাড়ী ব্যবহার করে, যাদের মধ্যে শতকরা ৭৮.১ ভাগ ব্যক্তি মালিকানাধীন । শতকরা ৫.৪ এবং ৪.৪ ভাগের রয়েছে যথাক্রমে মটরযান ও বাইসাইকেল। যেহেতু শহরের অধিকাংশ মানুষ গরিব সেহেতু বাইসাইকেল প্রধান যানবাহন হওয়ার কথা কিন্তু আ র্যের বিষয় এই যে, অবস্থাটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকজন বাইসাইকেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ; তারা বরং রিকশার প্রতি বেশি অনুরক্ত, যদিও এটি অধিকতর ব্যয়বহুল, মন্থর গতি সম্পন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় এক লাখ মানুষ ঢাকা শহরে রিকশা চালায় এবং প্রায় দশ লাখ লোক

Dhaka University Institutional Repository

এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, যা শহরের মোট জন সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ। জীবিকার উপায় হিসাবে রিকশার উপর নির্ভরশীল উক্ত লোকসংখ্যার মধ্যে রিকশা চালক ছাড়া রিকশা প্রস্তুতকারী ও মেরামতকারী অন্তর্ভুক্ত। যানবাহন হিসাবে রিকশার উপর শহরবাসীর প্রায় একান্ত নির্ভরশীলতা শুধু রাজধানী ঢাকার একক বৈশিষ্ট্য নয়; বাংলাদেশের সকল ছোট বড় শহর বন্দরে একই অবস্থা বিদ্যমান। রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চল ও রিকশা চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠছে। তবে রিকশার উপর অতিশয় নির্ভরতার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, দেশের গরিব জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের অনুপস্থিতি শিল্পায়নের অভাবে দেশের বড় বড় শহরে একই রিক্সার উপর নির্ভর করে চলছে পালাক্রমে কয়েকটি পরিবার। যারা ক্রমাগত গ্রাম থেকে প্রথমে ছোট শহরে আসে এবং কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ঢাকার মতো বড় শহরে ভীড় জমায় ও বস্তিতে বাস করে। আদর্শবাদে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েও সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যক্ত হয়। উপরোক্ত গ্রন্থের রচয়িতারা তাদের গবেষণায় লক্ষ্য করেছেণ যে, ঢাকা শহরের শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবার প্রধান ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ২৪ ভাগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা , ১৫ ভাগ মিশ্র অর্থনীতি এবং মাত্র ৭ ভাগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমর্থন করে। উক্ত গবেষণায় এটাও ধরা পড়েছে যে, যারা ইসলামিক অর্থনীতির সমর্থক তাদের বাড়ীতে কোনো বই- পুস্তক নেই এবং তারা সকলই অর্ধশিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ঢাকা শহর ধন সম্পত্তির মালিকদের বর্তমান পরিচয়ের মাধ্যমে রাজধানীর সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সনে ঢাকার সকল উচ্চ স্তরের ধনী পরিবার ছিল হিন্দু ও জৈন ধর্মালম্বী বহিরাগত মাড়োয়ারী। নব্বই এর দশকে ৬৮ টি কোটিপতি পরিবারের মধ্যে একটিও হিন্দু পরিবার নেই। এখন ঢাকার সকল বিত্তবান ব্যক্তিমাত্রই মুসলমান, যাদের বেশির ভাগ ধনী হয়েছেন ১৯৭১ সালের পর। তাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বড় বড় রাষ্ট্রীয় ক্রয় ও প্রকল্পের সাথে দালালীর যোগসূত্রতা, উড়োজাহাজ, পরিবহণ এবং যোগাযোগের সরঞ্জাম , জাহাজ, সেতু রাস্তা, কৃষিযন্ত্রপাতি, তৈল উত্তোলনের কাজ এবং ব্যবসায়মূলক চুক্তি ইত্যাদি এসবের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প অথবা অন্য ধরনের উৎপাদন মূলক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ধনী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। এদের প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে ধনসম্পদ সংগ্রহের সূত্র হচ্ছে "চৌর্যবৃত্তি," গচ্ছিত ধন অপহরণ এবং বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। আর এসবের সাথে জড়িত রয়েছে সরকারী অর্থ ভান্ডার এবং গুদাম, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, ব্যাংক ঋন পরিশোধ না করা, বিভিন্ন ব্যবসায়মূলক এজেন্সীর কমিশন প্রাপ্তি এবং ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদি। ঢাকা শহরের উপরোক্ত ধনী পরিবার সমূহের অধিকাংশই এসেছে অবিভক্ত ঢাকা জেলা (৪১ শতাংশ) থেকে এবং ১৫ ও ১০ শতাংশ হচ্ছে যথাক্রমে কুমিল্লার লোক ও পশ্চিমবঙ্গের শরনার্থী । আর অবশিষ্ট বর্তমান রাজধানী ঢাকাবাসী ধনী পরিবার হচ্ছে পর্যায়ক্রমে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা। এসব অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই নিজেদের "শিল্পপতি" হিসাবে পরিচয় দেয়, কারণ শিল্পপতি হিসেবে পরিচয় প্রদান এখন প্রশংসার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এদের বিশির ভাগই হচ্ছে বনিক ও ব্যবসায়ী।

ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ও উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা ভাসমান বলে পরিচিত তারা প্রধানত এসেছে বরিশাল (২৫.৬) ভাগ , ফরিদপুর (২২.৯ ভাগ), ঢাকা (১৮.৮ ভাগ), কুমিল্লা (১১.৯), এবং ময়মনসিংহ (৬.৩ ভাগ), জেলাগুলো থেকে আগত। আর অবশিষ্ট কম বেশি বাংলাদেশের অন্যান্য বৃহত্তর জেলা গুলো থেকে আগত। এসব গরিব মানুষ কদাচিৎ তাদের মূল গ্রামের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে। ধনী শ্রেণীর লোকেরাও তাদের গ্রামীণ বসতভিটার সাথে সংযোগ রক্ষা করতে চায় না। কিংবা প্রয়োজন ও পড়ে না। ঢাকা শহরের শুধুমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা বৈষয়িক কারণে তাদের স্ব স্ব গ্রামের সাথে মোটামুটি যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। গরিবদের অতি সামান্যই রয়েছে তাদের গ্রামে, যার টানে তারা সেখানে যাবার উৎসাহ পেত। গরিবদের অধিকাংশই হচ্ছে বিনা অনুমতিতে শহরের বাসিন্দা; এরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জবর দখলকৃত জায়গায় ভাড়াটে। সম্প্রতি এসব গরিব লোকজনের ভেতরও নানা কারণে গড়ে উঠেছে এক বিচিত্র ধরনের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা। তাদের মধ্যে টাকা পয়সা অর্জনের পরিমাণ ও উপায় ভেদে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ ঢাকা শহরের গরীব জনগোষ্ঠী ও আর অখন্ড শ্রেণী হিসাবে থাকতে পারছে না। ফলে তাদের ভেতর শ্রেণী সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্র আশানুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে না । রাজধানী শহর ঢাকার ভাসমান জনসমষ্টির মধ্যে রিকশা ওয়ালারা হচ্ছে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ পেশাজীবী গোষ্ঠী। এ প্রসঙ্গে এ কথাটি বলা বোধ হয় মিথ্যা হবে না যে, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা সহ বড় বড় শহরে যানবাহন বলতে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে রিকশা। যতদূর জানা যায় ১৯৩৭ সনে ঢাকায় রিকশা প্রথম চালু হয়। এটি এখন ঢাকা শহরে বহুল প্রচলিত পরিবহন। রিকশা চালক, রিকশা মালিক, রিকশা প্রস্তুতকারক তৈরি যন্ত্রাংশের খুচরা বিক্রেতা ও রিকশা মেরামতকারী ইত্যাদি মিলে রিকশার সাথে সংশ্লিষ্ট লোক সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দশ লক্ষ, যা ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ, এরা দৈনিক গড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় করে, যা অন্যক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির প্রায় সমান। ঢাকা শহরের সামাজিক কাঠামো সংক্রান্ত গ্রন্থে কামাল সিদ্দিকী ও তার সহযোগী গবেষকরা উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও পতিতাবৃত্তি ও অপরাধ কর্মে লিপ্ত লোকজনের সামাজিক পটভূমি পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যে বিদ্যমান স্তরবিন্যাস সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। তারা পতিতাদের চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এবং তাদের সাথে সংযুক্ত খদ্দেরদেরও সনাক্ত করেছেন। তাঁদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ঢাকা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বেকার যুবকরাই বেশি ছিনতাই ও রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ কর্মে লিপ্ত। সে যা হোক, কামাল সিদ্দিকী প্রমুখ গবেষকদের উক্ত মূল্যবান গ্রন্থটি প্রধানত ঢাকা শহরে বিদ্যমান সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে শুধু বিজ্ঞানসম্মত ধারণাই প্রদান করে না। এটি সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের স্বরূপ এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের ভেতর যোগাযোগের প্রকৃতি ও তাদের স্থানান্তর গমনের নমুনাও এতে বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে।[৮]

---

৮ প্রাগুক্ত; পৃঃ ১২১-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকা শহরের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ও শিক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক রূপ।

৫.১ শিক্ষা ও শ্রেণী ঃ সামাজিক কাঠামোগত পর্যালোচনা

সমাজ কাঠামোর সাথে শিক্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন একটি দেশের সমাজ কাঠামোই নির্দেশ করে সেখানে কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে যদি সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনা যায় তবে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। সমাজ কাঠামো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটিশসমাজ বিজ্ঞানী মরিস গিনস্‌বার্গের মতে, "Social structure is the complex of the principal groups and institutions which constitute societies."[১] অর্থাৎ সমাজ কাঠামো সমাজের প্রধান প্রধান গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে জটিল সম্পর্ক স্থাপন করে। সমাজ কাঠামোর সাথে শিক্ষার সম্পর্ক আলোচনায় আমি মূলত তিনটি বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। যেমনঃ ১) ধনতান্ত্রি ক দেশ সমূহ ২) সমাজতান্ত্রি ক দেশ সমূহ। ত) উন্নয়নশীল দেশ সমূহ।

এখন এই তিন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক কি তা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। মার্কসবাদীদের মতে, কোন একটি সমাজের মৌল কাঠামোই নির্দেশ করে সেই সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি , রাজনীতি সহ গোটা উপরিকাঠামোকে, পুঁজিবাদী দেশ সমূহে শ্রেণী বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তে সেখানে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবুও সেখানে সকলের জন্য শিক্ষা আজও বাস্তব রূপলাভ করেনি। সমাজতান্ত্রি ক দেশ সমূহে পরিকল্পিত ও সৃষ্ট আর্থ সামাজিক অবস্থার কারনেই একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

১ T. B. Bottomore; sociology, P. 113

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে আমরা যদি উন্নয়শীল দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সংকট ও নৈরাজ্য বিদ্যমান। সেখানে কোন সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। মোট-কথা তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়নশীল দেশ গুলোর শিক্ষার কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ছে। নির্ভরশীল তাত্ত্বিকদের মতে, উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের আঁধার হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব। উন্নত বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণ করে উন্নতির শিখরে উঠেছে। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের উপর দিন দিন নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। নির্ভরশীল তাত্ত্বিকদের মতে, উন্নয়নের নির্ঘন্ট সমূহের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম উপাদান। অথচ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি যা সব কিছুই যেন আজ উন্নত বিশ্বের নিকট বন্দী। তাই আমরা বলতে পারি তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা আজ সকলের জন্য নয়। সকলের জন্য শিক্ষা সেখানে কল্পনাই করা যায় না। কারণ শিক্ষার সামগ্রী সেখানে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। তাছাড়া, শিক্ষাখাতে বাজেট সেখানে খুবই নগন্য। অথচ সামরিক খাতে বাজেট অত্যন্ত বেশী। মোটকথা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায় একটি বিশেষ শ্রেণী তাদের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য দেশীয় স্বার্থের পরিপন্থী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিরোধী পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে চায় যে শিক্ষা উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না।

পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষা

পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস অনেকটা মিশরীয় পিরামিডের ন্যায়। পিরামিডের উপরে অযুত পতিদের অবস্থান। আর নিচে কোটিপতি ও লক্ষপতি এবং সর্বনিম্ন বিশাল জনসমাজ যারা দারিদ্র্যের অনধকারে দিন দিন নিমজ্জিত হচ্ছে।পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রেও মূলত এই চিত্রই প্রতিফলিত হয়।[২] যদি শ্রেণীগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করি তবে বলা যায়, "ধনতান্ত্রিক সমাজ আজ

---

২ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শিক্ষা ও শ্রেণী, পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যার দিক থেকে দুটো সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একটি বিদ্বান শ্রেণী অন্যটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একটি বিদ্বান শ্রেণী অন্যটি মুর্খ শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীটির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।[৩]

এই প্রসঙ্গে বৃটিশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিমন্ডলে মেকলের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৮৩৫ সালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে মেকলে যে মন্তব্য করেন, তাতে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজে শাসক ও শাসিতের ভেতর একটি মধ্যবর্তী শ্রেণী সৃজনের ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions; in morals, and in intellect.[৪]

শ্রেণী বিভাজিত পিরামিড সদৃশ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের প্রতিটি দেশেই বিদ্যমান রয়েছে। "সকলের জন্য শিক্ষা নয়" বরং শিক্ষার সাথে পুঁজির এক অপূর্ব সমন্বয়ই হচ্ছে তাদের শিক্ষানীতির মূলসূত্র। নিম্ন পর্যায় থেকে ক্রমেই শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে আসে উচ্চ পর্যায়ে। আর এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ব্রায়ান সাইমন বলেন, "এরূপ স্তরভেদ বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্বের বিশেষ কারণ স্কুলে পাওয়া যাবে না, ছেলেমেয়েদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। এর কারণ পাওয়া যাবে সমাজের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীভেদের কাঠামোর মাঝে"।[৫] অর্থাৎ শিক্ষার যে আদর্শ প্রাচীন সমাজেও অনুসৃত হতো তা আর

---

৩ বিনয়ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, পৃঃ ১৫৮

৪ G. M. Young, speeches by Lord Macaulay with his minute on Indian Education, London, P. 359

৫ ইন, টে, ব্রায়ন সাইমন, পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে হচ্ছে না, বিদ্যার্থীদের সেখানে কোন স্বাধীন সুযোগ সম্ভাবনা ও নেই- to enjoy the humanistic aspect of education as an end in itself.

বস্তুত এখানে শিক্ষার বিনিয়োগের দিকটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মানুষ নিজেও এক ধরনের মূলধন হিসেবে বিবেচিত । তথাপি উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগের গোড়া থেকে সারা পৃথিবী ব্যাপী শিক্ষার যে দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে- তার অধিকাংশই ঘটে উন্নত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ক্রমবৃদ্ধির সাথে শিক্ষা একটি ইন্ডাষ্ট্রি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ধনতান্ত্রিক সমাজে। বৃটেন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি ধনাতান্ত্রিক দেশ সমূহের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এরই প্রতিফলন। সভ্যতার সাথে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাগিদ থেকে শিক্ষার দর্শন কিংবা শিক্ষার আদর্শের চেয়ে শিক্ষার অর্থনীতিই আজ পুঁজিতান্ত্রিক দেশ সমূহে প্রাধান্য পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে M. Blang বলেন, "The cost of schooling and the money returns resulting from investment in Schooling are currently receiving more and more attention by economists, not only because of their possible implications for economic growth, but also because they may help individuals to determine how much they should invest in the development of their own human capital."[৬]

বুর্জোয়া তথা ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা ও পুঁজির মধ্যকার এ ধরনের সম্পর্কের কথা, টাকার সামাজিক আধিপত্যের কথা অনেক সমাজ বিজ্ঞানীরাই নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন, ভনমার্টিন, জর্জ সিমেল, ম্যাক্স ওয়েবার, কার্লম্যানহেইম, ভেবলেন প্রমুখ। সমাজবিজ্ঞানী মার্টিনের ভাষায়; "Priest and feudal noble are displaced from their

---

৬ M. Blang (Ed), Economics of Education, P.137

Dhaka University Institutional Repository

hegemony by the new ecomomic power of money and the indirect beneficiary of power of money, the independent intellectual".[৭]

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যদিও এটা সত্য যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষার উন্নয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ন্যায় সর্বজনীন হয়না, তবুও ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া রাষ্ট্র সমূহ তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমঃ উন্নয়ন এমনি এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে, প্রাথমিক শিক্ষা না হলে যথার্থ শ্রমশক্তি নিয়োগ করে অগ্রগতি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ফরাসী বিপ্লবের পর ১৭৯১ সালের গঠনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণকে।

শুধু তাই নয় ১৮৭০ সালে জার্মানীর দ্রুত উন্নয়ন দেখে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ উপলব্ধি করলো যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই এর উন্নতির একমাত্র কারণ। ফলে ইংল্যান্ডে তার যন্ত্র শিল্পের প্রয়োজন ও শিল্প উন্নতির তাগিদ থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, গোটা ধনতান্ত্রিক ইউরোপ শুধুমাত্র তাদের উৎপাদনের প্রয়োজনেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়নি। ইংল্যান্ড প্রাথমিক শিক্ষাকে বুর্জোয়ারা তাদের শোষণের লক্ষ্য থেকেই শ্রেণী সমঝোতার মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল বলে অনেকে মনে করেন। শিক্ষার মাধ্যমে তারা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর মাঝে (Antagronistic class) দ্বন্দ্বের (conflict) পরিবর্তে সংহতি (Integration) বা সমঝোতার পথ ও প্রসারিত করতে পেরেছিল। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে সমন্বয় করে চলার মানসিকতা ও সঞ্চার করতে পেরেছিলো তারা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে Bigg and Godon বলেন, "The function was to provide the workers with a discipline by consent. In the 19th century the employers relied or

---

৭ Alfred von Mertin, Sociology of Renaissance, P.37

Dhaka University Institutional Repository

discipline by fear...' fear of unemployment etc...But in industry discipline by fear is a far from satisfactory. Educator can help to create another form of discipline . It developes a capacity for looking at both sides of a question and with out such discipline, co-operation between sides of industry is impossible. In this respect education works very slowly but the seeds of a movement that is rapidly development today were planted in the first stages of working class education in the 19th century."[৮]

তাই দেখা গেল ইংল্যান্ডে আধুনিক শিক্ষার শুর তেই দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু হলো। সাধারণ মানুষের জন্য এক ধরনের শিক্ষা আর অভিভাবকদের জন্য অন্য ধরনের শিক্ষা । সাধারণ মানুষের জন্য নিম্নতর শিক্ষা চালু প্রসঙ্গে বলা হয়।- " Public education for the poor as a means of giving them a useful occupation and a better realization of their position of inferiority in society. If Properly educated, they would not be so apt to means the lives or destroy the property of the better classes of society".[৯]

অর্থাৎ শোষণ ও বৈষম্যের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্য থেকেই ধনতান্ত্রি ক দেশের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয়। আর এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরো কর ণ। সেখানকার সংবিধানে শিক্ষা বিষয়ে কোন প্রস্তাবই লেখা নেই। জেফারসন ও ম্যাডিসন প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ে শিক্ষার ধারা যুক্ত করে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে তা নাকচ করে দেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষার দিকে সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মাথা ব্যাথাই নেই। সবই নিয়ন্ত্র ণ করে থাকে রাজ্য সরকার।

---

৮ Bigg and Gondon, Economic History of England, P. 669

৯ Carroll Akkinson and Eugine T. Maleska, The Histry of education, P. 163

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের সামনে ভেসে উঠে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও বৃটেনের ছবি। বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি সাম্প্রতিক মাইলস্টোন হচ্ছে জাপান। শিল্পের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও অকল্পনীয় উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই দেশটি। ১৯৬৮ সালে মেইজী সংস্কার প্রবর্তনের পর শিক্ষা ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে জাপানের ক্ষেত্রে প্রধানত ভূমিকা রয়েছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি শিক্ষিত ও সুদক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে তাদেরকে আধুনিক উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করে জাপান তার বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের কাছে আজ মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা খাতে অধিক বিনিয়োগ করে জাতি হিসেবে তাদের আত্মমর্যাদা বোধ, বিলাসিতা, তথা ভোগ, কৃচ্ছতা সাধন করে পরিকল্পিত শিক্ষানীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ১৮৮৬- ৯৭ এ শিক্ষা ব্যবস্থা সাংগঠনিক সমন্বয় ১৮৯৯-১৯১৬ এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। ১৯১৭-৩৯-এ শিক্ষার সম্প্রসারণ, ১৯৪০-৪৬ শিক্ষার পুনর্গঠন এবং ১৯৪৭-৬১- শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রীকরণের উদ্যোগ এবং প্রয়াসই শিক্ষাখাতে জাপানে উন্নয়নের সোপান হিসেবে কাজ করেছে।[১০]

সারণী ঃ ৫.১

জাপানের শিক্ষায় উন্নয়নের গতিধারা

↓

বছর	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চশিক্ষা
১৮৭৫	৩৫.২%	০.৭%	.৪%
১৯২৫	৯২.৪%	৩২.৩%	২.৫%
১৯৮০	৯৮.৪%	৯২.০%	২৯.৮%

উৎসঃ Carroll Akkinson and E. T. Maleska, The History of Education P.164

[১০] হাফিজুর রহমান, শিক্ষা ও উন্নয়ন, পৃঃ ১২৩-৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এটি বলাই বাহুল্য যে, জাপানে শিক্ষিতের হার ১০০% হলেও শিক্ষার সুযোগ সকলের সমান নয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত কারণে বিশেষ করে যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস পিরামিড সদৃশ, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্তরায়ন ও স্বাভাবিক। বাহ্যিকভাবে জাপান কে একটি শিক্ষিত জাতি বলে মনে হলেও তুলনামূলক বিচারে জাপানের অধিকাংশ লোকই তাদের সর্বোচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রেণীগত স্বার্থ ও পুঁজির দাপট জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও প্রাধান্য পাচ্ছে।

আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাই তাহলে এ সত্যটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শ্রেণী বিভক্ত এ সমাজ টিতে কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করছে বৈষম্য, পুঁজিবাদের মূল শক্তি 'পুঁজি' বিশেষত 'ব্যক্তি' "পুঁজির" সাথে শিক্ষার কি ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন(Allison Davis) নামক একজন আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী। তিনি তাঁর Social Class influence upon learning নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর গবেষণা করেছেন।

১। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

২। শিক্ষা জীবনের শুরুতে শিশুদের উপর প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রভাব।

৩) প্রতিটি শ্রেণীর সংস্কৃতির ভাল-মন্দ উভয়টির প্রভাব।

৪। শিশুদের মানসিক ভারসাম্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব।

৫। শিশুর শিক্ষা কর্মসূচী ও পাঠ্যসূচীর উপর সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব ইত্যাদি।

Allison Davis এর মতে, "সামাজিক শ্রেণী সমূহই আমেরিকার সমাজে বিভিন্ন মর্যাদা গোষ্ঠীর স্তরায়নের মূলভিত্তি। তাঁর ভাষায়, "There are three broad systems of status each of them lending to restrict the cultural and, therefore the, learning environment of children; are 1) Social classes, 2) the enhric or foreign

groups 3) the color- castes. These three types of social stratification differ with respect to the opportunity allowed an individual, living within the system, to move into a social rank other than in to he was born."[১১]

এই তিনটি প্রধান শ্রেণী আবার তাদের নিজেদের গোষ্ঠীগত prestige valua এর তারতম্যের জন্য উচ্চ শ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি প্রধান সামাজিক শ্রেণীর মাঝে আবার তারতম্য ও পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, এবং নিম্ন শ্রেণী আবার উচ্চ- উচ্চবিত্তশ্রেণী, উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণী, উচ্চ নিম্নবিত্ত শ্রেণী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নিম্ন উচ্চ শ্রেণী, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইত্যাদিতে বিভক্ত বা স্তরায়িত। যার প্রতিটির মাঝে রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তারতম্য বা বৈষম্য। Allison এর ভাষায় "In our society this cultural differentiation is greatest between socio-economic strata. This socio-cultural difference well therefore differentiation between the kinds of phenomena, and skills, which groups of pupil have learned in respect to certain types of problems and which they have available for integration into a system of acts leading to the final solution of a particular problems.[১২] অর্থাৎ ট্রাক সিস্টেম অব এডুকেশনের কৌশলে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের কে নানা বৈষম্যের ধারায় প্রবাহিত করা হচ্ছে। সর্বাত্মত কিংবা মালটিলেটারেল প্রভৃতি চমকপ্রদ ব্যবস্থাপনার নামে নানা ধরনের স্কুল ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের নানা স্রোতে বিভক্ত করে দেয়া হচ্ছে। ফলে কারো ভাগে গ্রামার স্কুল, কারোভাগে টেকনিক্যাল কিংবা কারো ভাগে জুটছে মডার্ণ- স্কুল, অর্থাৎ এক ছাঁদের নীচে সমাজের সকল শিশুদের জড়ো করা নয় বরং শুরু থেকেই শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা।

---

১১ Allison Davis, Social class influence upon learning, P. 56

১২ Opcit, P. 60

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব ও ব্যাপক সাফল্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্রমাগত শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ১৯২৯-৩০ সালে যেখানে তাঁদের বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমে ১৭৩০০ কোটি ও ১৮০০০ কোটি ডলার সেখানে ১৯৫৮ সালে উন্নতী হয় ৫৩৫০০ কোটি ডলারে। অর্থাৎ ২৮ বছরের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬২০০ কোটি ডলার। যার ফলে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ও সাধিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার অবদান উন্নতি হয়েছে ২১% এ।[১৩]

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা

শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নত বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়েই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বিশাল জনগোষ্ঠী উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। উৎপাদিত দ্রব্যের উপরও তাদের কোন অধিকার থাকে না। এমনকি নিজের শ্রমের উপরও শ্রমিক অধিকার হারায় । সুতরাং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সব মানুষকে শোষণ- বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা প্রদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব।[১৪]

ভ. ই. লেলিনের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের মধ্যদিয়ে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের পর লেলিন কর্তৃক মনোনীত সোভিয়েত ইউনিয়নের জনশিক্ষা কমিশনার আনাতোলি লুনাচারাস্কি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমাদের রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে জনগণের যাবতীয় কেন্দ্রগুলো তার

---

১৩ Theodore S. W. Schultz, Economic value of Education, P. 254

১৪ মোঃ মঈনুল ইসলাম, "সমাজতন্ত্রের সংকট ও সম্ভাবনা, " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯০, পৃঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী হাতের মুঠোয় নিতে শুরু করেছে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে কিভাবে সে শাসন করবে, নিজের অর্থনীতি চালাবে ? স্কুলেই তাদের জ্ঞানার্জনের কথা। কিন্তু এতো শামুক চলছে, এক সময় এখানে পৌছবে এমন অবস্থা এখনি, এখনই জ্ঞান দেয়া দরকার। আর কেবল বর্তমান অবসান ঘটিয়ে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় , বিপ্লবের পর লেনিন কর্তৃক মনোনীত সোভিয়েত ইউনিয়নের জনশিক্ষা কমিশনার আনাতোলি লুনাচারাস্কি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমাদের রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ভাবে জনগণের যাবতীয় কেন্দ্রগুলো তার শক্তিশালী হাতের মুঠোয় নিতে শুরু করেছে কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে কিভাবে সে শাসন করবে, নিজের অর্থনীতি চালাবে ? স্কুলেই তাদের জ্ঞান অর্জনের কথা । কিন্তু এত শামুক চলছে, এক সময় এখানে পৌছবে এমন অবস্থা এখনিই, এখনই জ্ঞান দেয়া দরকার। আর কেবল বর্তমান প্রজন্মকে নয়, যাদের মধ্যে থেকে আমাদের আশানুযায়ী জন্মাবে নতুন মানুষ । জ্ঞান দিতে হবে সম্প্রতি জয়ী হয়েছে এমন প্রত্যেকটি মানুষকে।"[১৫]

আর এই জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে লুনাচারাস্কি বলেছিলেন, "আমরা চাই একজন মানুষকে একই শিক্ষা দিতে যে মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হবে, যে যথাসম্ভব পূর্ণ শিক্ষা পাবে, যে কোন একটি ক্ষেত্রে সহজেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করতে পারবে। এমন একজন মানুষ তৈরী ও আমদের লক্ষ্য , যে হবে সহনাগরিকদের সত্যিকার সহকর্মী, শুভাকাঙ্খী, অন্য সকল মানুষের জন্য একজন কমরেড আর সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য সংগ্রাম চলাকালে একজন যোদ্ধা তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"[১৬]

সত্যিকার অর্থে বলতে কি লেলিন চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে এমন মানুষ সৃষ্টি করতে, "যে মানুষ হবে দৈহিক দিক থেকে সুন্দর, সমন্বিতভাবে বিকাশমান, সুশিক্ষিত এবং প্রযুক্তি, চিকিৎসা

---

১৫ আনাতোলী লুনাচারাস্কি, নির্ধারিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা সংকলন, প্রগতি প্রকাশন পৃঃ ৫৯

১৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানী আইন, সাহিত্য ইত্যকার দূর বিচ্ছিন্ন বিদ্যাসমূহের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর মূল তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত"।[১৭]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জারতন্ত্রের কাছ থেকে সোভিয়েত শাসন যে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছিলো তার মাঝে ছিল সামন্ততন্ত্র, অজ্ঞতা এবং ভূমিদাসও । বিপ্লবের পর পর শুরু থেকেই "সোভিয়েত শাসন সর্বরকম শ্রেণীগত বিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিকদের জ্ঞানের দ্বারা সশস্ত্র করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টায় জনশিক্ষা ব্যবস্থাটিকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। তাব জন্য জ্ঞানের বিপ্লব সামগ্রীর ভেতর থেকে জনগনের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যা সবচেয়ে বেশী দরকার সেগুলোই সোভিয়েত শাসন সর্বপ্রথম বেছে নেন।"[১৮]

বলা প্রয়োজন যে, একটি আধাসামন্তবাদী ও প াৎপদ ভঙ্গুর অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপ্লবের অব্যবহতি পরই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করে যেমনি দ্রুত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে থাকে ঠিক তেমনি বিশ্বের বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে থাকে একটি আত্মনির্ভরশীল শিক্ষিত জাতি হিসেবেও। গোটা দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক ও চেতনাগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেলিন, স্টালিন, ক্রু ড থেকে শুরু কের সকলেই তাদের পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মার্ক্সীয় আর্দশে উদবুদ্ধ করে গোটা দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবের পর লেলিন সমগ্র রাশিয়ায় ঘুরে বেড়ান, বক্তৃতা করেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের "গোথা কর্মসূচী", লেলিনের "যুবকদের প্রতি সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব", আনাতোলী লুনাচারাস্কির শিক্ষা প্রসঙ্গে নাদেজদা ক্রুপস্কায়ার শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ বেশ প্রণিধানযোগ্য।

---

১৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬

১৮ নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, শিক্ষা দীক্ষা, পৃঃ ২০৬- ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শগত মতবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মাঝে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটে লেলিন ও স্টালিনের সময়ে। লেলিনের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সমাজকে সাম্যবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।"[১৯] শুধু তাই নয়, লেলিন বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন প্রায়োগিক ও আদর্শগত জ্ঞান। তাই তিনি বলেন, "জীবনের ঝড় ঝঞা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবলমাত্র স্কুলের গন্ডির মাঝেই যা বন্দী তেমন শিক্ষাদান, ট্রেনিং বা বিদ্যায় আমরা বিশ্বাস করি না, ... আমাদের স্কুলে তরুনদের পাওয়া উচিৎ জ্ঞানের মূল সূত্র গুলি, স্বাধীনভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদ গড়ে তোলার ক্ষমতা। স্কুল থেকে তরুনদের গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষিত মানুষ করে, স্কুলে পড়ার সময়ই শোষকদের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরূপে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।"[২০] আর শিক্ষা সম্পর্কে স্টালিনের অনুসৃত নীতির প্রধান ভিত্তি ছিল তার গভীর বিশ্বাস যে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। ক্রুশ্চেভ ও পঁচিশ বছর প্রায় একই সুরে ঘোষণা করেন "সাম্যবাদ অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান পদক্ষেপ হলো আগামী দিনের মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।"

আর এই উপলব্ধি থেকেই বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার একে একে শিক্ষার উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ১৯২৪ সালে গৃহীত হয় প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠন ও উন্নয়নের একটি ব্যাপক পরিকলপনা। এর লক্ষ্য ছিল ১০ বছরে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে ৪ মিলিয়ন থেকে ৮ মিলিয়নে উন্নীত হবে এবং এর জন্য অনুমিত ব্যয় ছিল ১.২৬ বিলিয়ন রুবেল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মাত্র বছর সময় কালে জাতীয় উৎপাদন আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশী। শিক্ষা ও উন্নয়নের এক চমৎকার

---

১৯ উদ্ধৃত, হাফিজুর রহমান, শিক্ষা ও উন্নয়ন, পৃঃ ৬২

২০ ভ. ই. লেলিন, সংকলিত রচনাবলী , ২য় খন্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৪৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায় ১৯৬২ সালে লেখা সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এস, জি, স্ট্রুমিলের গবেষণা নিবন্ধ থেকে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৬০ সালে সোভিয়েত জনগণের মোট জাতীয় আয় ছিল ১৪৬.৬ বিলিয়ন ডলার। আর এর ২৩% এর উৎসই ছিল জনগনের উন্নতমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা"[২১] নিম্নে তাঁর গবেষণালব্ধ আরো কিছু ফলাফল তুলে ধরা হলো।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই সফলতা সোভিয়েত শাসকদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির প্রতি আরো আগ্রহ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে দেখা যায়, ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার ৭৫% সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকলেও ১৯২০-২৯ সালের মধ্যে ৫৭.৫ মিলিয়ন নিরক্ষর ও৩৮.৫ মিলিয়ন অর্ধ স্বাক্ষর ব্যক্তি বিদ্যালয়ে লিখন ও পঠনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। অপর দিকে ১৯২৪-৩৫ সালের মধ্যে ২৩.৮ মিলিয়ন ও ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৭.১ মিলিয়ন ৭ বছরের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করে। দক্ষ কর্মীদের মাঝে শিক্ষার বিস্তার ক্রমেই আরো ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। ফলে ১৯১৮-১৯৬০ সালের মধ্যে সোভিয়েত অর্থনীতির উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন এবং মাধ্যমিক কারিগরি বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৭.৭ মিলিয়ন সহ মোট ১২ মিলিয়নের ও অধিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞান লাভ করে। ১৯৪০-১৯৬০ এ সময়কালে শিক্ষার উন্নয়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতেও প্রবৃদ্ধি ঘটে। যার ফলে স্থিতিশীল মূল্যে সোভিয়েত জাতীয় আয় ৩৩.৪ বিলিয়ন রুবেল থেকে ১৪৬.৬ মিলিয়ন রুবেল এ উন্নীত হয়। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩৮% এই ২০ বছর সময়কালে উৎপাদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪.৬ মিলিয়ন থেকে ৬৮.৪ মিলিয়নে উন্নীত হয়। এই সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বর্ধিত যোগ্যতা ও উৎপাদন ক্ষমতা যোগ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালের বস্তুগত উৎপাদন ৫৫.৭ বিলিয়ন রুবেল থেকে ১৭৪ বিলিয়ন রুবেলে উন্নীত হয়

---

[২১] S. G. Strumilir, The Economic significance of peoples Education, U. S. S. R. PP. 71-85.

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অগ্রগতির ফলে জাতীয় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬২৬ শতাংশ বা ৬ গুণেরও বেশী। এই লভ্যাংশ ১৯৪০ সালে ৫২% থেকে ১৯৬০ সালে ১৪৪% এ উন্নীত হয়। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৬২ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ২৭ শতাংশ আসে শিক্ষায় বিনিয়োগ ও তার শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি থেকে। ১৯৭০ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায়, সমগ্র রাশিয়ার শতকরা ৯৯.৪ জন পুরুষ এবং ৯৯.৭ জন মহিলা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক প্রাণহানি এবং ১৯১৭ সাল থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক অবরোধ থাকা সত্বেও মাত্র পাঁচ দশকে বিশ্বের তৃতীয় জনবহুল দেশ রাশিয়ায় শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞদের উত্থান সম্ভব হয়েছে। আজকের বিশ্বে প্রকশিত বইয়ের, শিক্ষারত ছাত্রের, গবেষণাকর্মী এবং ডাক্তার এক চতুর্থাংশ রাশিয়ার নাগরিক। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাদের সংখ্যা ৫৪ জন। চীন ও অন্যান্য দেশেও রাশিয়ার গতি বেগে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে।[২২]

তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা

পরনির্ভরতার শৃংখলে আবদ্ধ উন্নত বিশ্বের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়শীল দেশ সমূহের অধিকাংশেই আজ বিরাজ করছে নানামুখী সংকট। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সম্মিলিত আয় হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মাত্র $\frac{১}{৩}$ অংশ। মাথাপিছু আয় ১০০ ডলারের মতো। উন্নত বিশ্বের ১০ ভাগের ১ ভাগ জীবন যাত্রার মান ও তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য নি িত হয়নি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আশংকাজনক। (আফ্রিকায় ২.১, ল্যাটিন আমেরিকায় ২৭-২৮, প মি এশিয়ায় ২% দঃ পূর্ব এশিয়ায় ২.৩) নিরক্ষরতার হার ৭০-৮০ শতাংশ (আফ্রিকায় ৮০-৮৫%) দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৮০-৮৫%), ল্যাটিন আমেরিকায় ৪৪% , অথচ উত্তর

---

২২ দেখুন ঃ আব্দুল খালেক, দৈনিক সংবাদ, ২৮ শে মার্চ, ১৯৮৮ পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে এর হার হচ্ছে ১-৪ মাত্র)। মাথাপিছু শিক্ষাখাতে ব্যয় মাত্র ২৭ মার্কিন ডলার (উন্নত বিশ্বে ৪২৮ মার্কিন ডলার)। ১৯৮০ সালের হিসেব মতে বিশ্বের মোট ৮২ কোটি ৪০ লক্ষ নিরক্ষর লোকের মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে। বলতে গেলে উন্নয়নশীল দেশের প্রতি ২ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের একজনই নিরক্ষর। বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক শোষণের প্রক্রিয়ায় এ নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যা ইতিমধ্যে, ১০০ কোটিকে ও ছাড়িয়ে গেছে।

তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট সমূহকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রধানত যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেখা হয় সেগুলো হচ্ছে" (1) Low literacy rate, (2) law prticipation rate (3) high repetition rate and dropout rates, (4) low achievement level.[২৩]

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা সংকটের একটি প্রধান ও অন্যতম চিত্র হচ্ছে নিরক্ষরতা। অবশ্য এ ছাড়াও রয়েছে আরো নানা সমস্যা। যার প্রথমটি হচ্ছে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার সীমিত সুযোগ। ১৯৮৫ সালের হিসেবে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ সমূহে স্কুল গামী শিশুদের সংখ্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার অনুপাত ক্রমেই হ্রাস পেয়ে আসছে। অর্থাৎ শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে না।

উন্নয়শীল দেশ সমূহে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে তা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে নানা কারণে ঝরে পড়া জনিত(Repeaters and drop out problems) সমস্যা। এ সমস্যাটি এতই প্রকট যে, উন্নয়নশীল

---

২৩ **Relevance of Education to Rural Development**, UNESCO, APPEID, PP. 2-3

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ তথা প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করা প্রতি ৫ জন ছাত্রের মধ্যে ২জন বা ৩ জন পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বাস করে চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে। ছেলেমেয়েরা সচ্ছলভাবে নিতি হয়ে শিক্ষাজীবন পরিচালনা করতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়েই তাদের পারিবারিক আয়ের পথ খুজঁতে হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যস্থতা, সম্পদের অভাব নানা প্রতিকুলতাই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে এ জটিল পরিস্থিতি। ফলে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, শিক্ষার সর্বস্তরেই বিরাজ করছে নাজুক অবস্থা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার অনুন্নয়নের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষাখাতে স্বল্প ব্যয় বরাদ্দ ও শিক্ষা সংকোচন নীতি। ক্রমশঃই শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ অন্যান্য খাত, এমনকি সামরিক খাতের মতো অনুৎপাদনশীল খাতের তুলনায় ও হ্রাস পেয়ে চলেছে। উন্নত বিশ্বে যেখানে শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৮ শতাংশ ব্যয় করা হয়, সেখানে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে ব্যয় করা হয় মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ, বাংলাদেশে এর হার আরও কম। মাত্র ১.৮%। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতেও বরাদ্দ বৃদ্ধি না হয়ে বরং হ্রাস পেয়ে চলেছে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুল থেকে হাই-স্কুল এবং হাই স্কুল থেকে কলেজ এর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট ছাত্রের খুব কম অংশই স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পায়, এবং যাও পায় তারও আবার একটা বিরাট অংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় ঝরে পড়ে নানা কারণে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় শিক্ষার পরবর্তী প্রতিটি স্তরে। সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে প্রতি ১০০ জনের ১০% প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে, এর ৬০% অতিক্রম করে মাধ্যমিক স্তর এবং এরও মাত্র ২০% উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। আফ্রিকায় এ চিত্রটি আরো করুণ।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব উন্নয়ন সংস্থার আর একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, নিম্ন আয়ের দেশ সমূহে হাইস্কুল তালিকাভূক্তি বা নাম লেখানো 'enrolllment' ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা অনুপাতে ১২-১৭ বছরের মধ্যে ছিল ৩৪% সেখানে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে ছিল ৯০% অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ সমূহের তুলনায় এটা প্রায় ৩ গুণ।[২৪] কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮০ সালে অনুন্নত দেশ সমূহে এই স্তরে অধ্যায়নরত ছাত্র- ছাত্রীদের হার কলেজ বয়সী মোট ছেলেমেয়েদের ৭.৪% মাত্র। আর উন্নত দেশ সমূহে এটা ৩০%। উল্লেখ্য যে , মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০-২৪% এই বয়সী, অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের জন্য উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ সমান মাত্রায় নয়। যেমন আফ্রিকায় এর হার ১৪.৩%।[২৫] মোটের উপর উন্নয়নশীল দেশের পিরামিড সদৃশ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই বিরাজ করছে সংকট। উন্নত দেশ সমূহেব সাথে এর রয়েছে বিরাট ব্যবধান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দক্ষিণ আমেরিকায় যেখানে প্রতি ১০০ জন ছাত্রের মাঝে ৪০ জনই কলেজে প্রবেশ করে সেখানে আফ্রিকায় মাত্র ২৫ জন। উত্তর আমেরিকায় যেখানে প্রতি ৫ জনে ৪ জন প্রাথমিক স্কুল থেকে হাইস্কুলে প্রবেশ করে সেখানে ল্যাটিন আমেরিকায় মাত্র ১ জন। নিরক্ষর ও স্কুলভুক্ত ছেলেমেয়েদের এই সংখ্যাচিত্র থেকে পরিস্কার হয়ে উঠে যে, অনুন্নত দেশ সমূহে প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশই আজ শিক্ষার নিম্নস্তরে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ওপর পরিচালিত জরীপের মধ্য থেকে অনুন্নত দেশ সমূহের শিক্ষার অবস্থার চিত্র আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠে। জরিপে দেখা যায়, ২৪টি দেশের মাঝে ১২টি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের প্রায় ৭৫% প্রাথমিক স্কুল অতিক্রম করতে পারে না। এমনকি এই ১২টি দেশের ৯টিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের ৯০% প্রাথমিক স্কুল অতিক্রম করতে পারে না।[২৬]

---

২৪ World Bank, washington, D, C, P.P. 298-309

২৫ UNESCO, 1984, Statistical yearbook, Table 2.10 P. 16

২৬ UNESCO, 1994, Statistical yearbook, Table 2. P. 16

এটি বলাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত যে, উন্নয়নশীল দেশ সমূহে যেখানে আজও মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত হয়নি, যেখানে গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য আজও মানুষ লড়াই করে চলছে, যেখানে রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র নয়, সেখানকার শিক্ষায় সংকট থাকবে এটা যেমনি স্বাভাবিক ব্যাপার, তেমনি শিক্ষায় সংকটের কারণ উদ্‌ঘাটনে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রাষ্ট্রীয় চরিত্র, ও এর শ্রেণীগত বিশ্লেষণ ও অতি আবশ্যক। কেননা তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে কিংবা প্রান্তিক রাষ্ট্রে কিংবা উপনিবেশত্তোর রাষ্ট্র সমূহের সার্বিক সংকট আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ, আন্তর্জাতিক পুঁজি বা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রতিফলন। এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাজের যে বিশেষ শ্রেণীটি রয়েছে তারা সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সাম্রজ্যবাদ নানা কৌশলে কখনো অর্থনৈতিক , কখনো কারিগরি কখনো আবার খাদ্য সাহায্যের নামে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খাটিয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে তাদের নীল নক্‌শা অনুযায়ী প্রনীত হচ্ছে এই সমস্ত দেশের শিক্ষানীতি, পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে শিক্ষা সংকোচননীতি বাস্তবায়নের ধারায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিজাতীয় ও বিকৃত তথ্য ও আদর্শাবলী, শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে উঠছে গুটি কতকের স্বার্থে, ব্যক্তি পুঁজি গড়ার মাধ্যম বিশেষ। অবশেষে বলতে চাই বিকাশশীল পুঁজিবাদী ধরনের রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমি মূলত বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

৫.২ ঢাকা শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান সমস্যাবলী

বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত হবার পর কঠোরত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ জাতীয় স্বাধীনতার অর্জন করেছে। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতা নিপীড়ন ও শোষণের মধ্যেও এদেশের জনগণ কখনও উন্নত ও মহৎ জীবনের স্বপ্ন পরিত্যাগ করেননি। এক সমৃদ্ধ, আনন্দময় জীবন সৃষ্টির জন্য তারা নিরন্তর শ্রমে রত থেকেছেন, বারবার সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন। অবশেষে স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় তাদের নবজীবন সৃষ্টির উজ্জলে সম্ভবনার তোরণ দ্বার উন্মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এই নব জীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, সে সত্য এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এজন্যই শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের জনসম্পদ বিপুল, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রচুর, প্রয়োজনীয় জনসম্পদের উপযুক্ত শিক্ষার এবং নিজেদের জীবনকে সুন্দর ও সুসমৃদ্ধ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর যথাযথ দক্ষতা অর্জনের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহ তাদের নিষ্ঠুর শোষণের স্বার্থে এদেশের শিক্ষা বিস্তারের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণও ছাত্র সমাজ বারংবার এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আজ স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন তাই জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্ব রূপে দেখা দিয়েছে।

এবার আমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সমস্যাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করব।

হাই স্কুল

ঢাকা শহরে হাইস্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা থেকে শুরু করে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। নতুন বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির পালা। ভর্তি একেবারে নার্সারী থেকে ক্লাশ নাইন পর্যন্ত। উপরের দিকে ভর্তি প্রার্থীদের ভিড় কিছুটা কম থকলেও নিচের দিকে ভীড় খুবই বেশী। বলা যায় যত নীচে তত ভীড়। আবার অন্যভাবে বলা যায় গ্রাম থেকে শহরের এবং ছোট শহর থেকে বড় শহরে এ ভীড় ক্রমেই বেশী। সেই সুবাদেই রাজধানীতে ছোট বড় অসংখ্য স্কুল থাকা সত্বেও এখানেই ভীড় সারা দেশের মধ্যে সবচাইতে বেশী। মহানগরীতে যদিও কেজি, প্রাইমারী, হাইস্কুলে মিলে স্কুলের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু ভাল তথা নামকরা স্কুলের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সবারই স্বপ্ন তার ছেলে মেয়েকে ভাল স্কুলে দিতে হবে । অতো ভাল স্কুলে তো আর নেই, তাই যে কটি নামকরা ভাল স্কুল আছে ভর্তিচ্ছু ছাত্র ছাত্রীদের ঢল নামছে সেখানে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বাসীদের একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে এখন প্রায় প্রতি মহল্লায়ই কেজি স্কুলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেসব স্কুলে পড়ানো যাই হোক না কেন, ঠাটবাট আছে যথেষ্ট এবং ঠাটবাটের পরিপোষক টিউশন ফি ও রয়েছে। নার্সারী, প্লেগ্রুপ বা ক্লাশ ওয়ানেই যখন ছাত্র বেতন দু'শর কাছাকাছি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সড়ক নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে গার্জিয়ানরা ও এসব কেজিতে টাকা ঢেলেই বাচ্চা ভর্তি করান। এতে সুবিধা মায়ের নিজেরাই বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে আসা বা স্কুল থেকে নিয়ে আসার কাজটা সারতে পারেন। তবে সাধারণত কোন গার্জিয়ানই ক্লাশ টুয়ের পর সাধারণত কেজি স্কুলে বাচ্চা রাখতে চান না। তখনই সন্ধান পড়ে ভাল একটা হাই স্কুলের, নিদেন পক্ষে কোন ভাল প্রাইমারী স্কুলের । নীচের দিকে ভাল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা মানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গার্জিয়ানদের ও কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। ভাল স্কুল মানেই পরীক্ষায় বিষম কড়াকড়ি। আর ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা মানে অনেকটা যেন গার্জিয়ানদেরই ভর্তি পরীক্ষা।

সরকারী স্কুল নয়, অথচ খুব ভাল স্কুল, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি বহুগুন বেশী, তবুও সেখানে ভিড়ের শেষ নেই। মতিঝিল, আইডিয়াল সকুল ভিকারুন্নেছা স্কুল, হলিক্রশ স্কুল এসব প্রতিষ্ঠনে নীচের দিকে বাচ্চা ভর্তি করতে পারলে গার্জিয়ানরা হাপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু ভর্তির সুযোগ পাবে যারা তার তুলনায় ভর্তি পরীক্ষা দেয় বহুগুণ ছাত্র- ছাত্রী। ফলে অধিকাংশ ভর্তি প্রার্থীকে হতে হয় হতাশ। তাই প্রতি বছরই ভর্তির মওসুম এলে সবার মাঝেই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় মহানগরীতে এত স্কুল আরও অনেক স্কুল কি আইডিয়াল প্রভৃতির মতো ভাল স্কুল হতে পারে না? আরও সব নাম করা ভাল স্কুল থাকতে মতিঝিল, আইডিয়াল হাইস্কুলের নাম উল্লেখ করতে হয় এ জন্য যে, ভিকারুন্নেছা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তদানীন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পত্নী লেডী ভিকারুন্নেছা নুন; যাত্রা শুরু থেকেই স্কুলটি সরকারী না হলেও উপর মহলের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভে ধন্য হয়। হলিক্রশ স্কুলেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের অভাব পড়েনি প্রতিষ্ঠা কালে। আইডিয়াল স্কুলের যাত্রা একেবারেই সাধারণভাবে খুবই গরীবানা ভাবে স্থানীয় প্রচেষ্টায় অত্যান্ত গরীবানা ভাবে শুরু করেও যে স্কুলটি আজ সরকারী-

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী নির্বিশেষে দেশের অন্যতম সেরাস্কুলে পরিণত হয়েছে সেটা সম্ভব কিসের জন্য সে গুণটা অর্জনের চেষ্টা কি নাম না করা অন্যান্য স্কুল করতে পারে না? মানুষের চেষ্টা তো অসাধ্য কিছু নেই। চেষ্টা করতে কোন দোষ নেই। কথা গুলো বলতে হয়েছে এই জন্য যে, একটা ভাল স্কুল থেকে হতাশ হয়ে গার্জিয়ানরা যখন কম ভালো কোন স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে বাধ্য হন, তখন তাদের মনে এই কথাটাই জাগে বেশী করে এতবড় একটা মহানগরী এখানে ভাল স্কুলের সংখ্যা এত কম কেন? নতুন বছর এসেছে, নতুন বছর নিয়ে এসেছে সবার মনে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা। কিন্তু ছোট ছেলে মেয়েদের গার্জিয়ানদের মনে নিয়ে এসেছে নতুন টেনশন, নতুন উৎকণ্ঠা কোন ভাল স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করানো যাবে কি ? এই উৎকণ্ঠা নিয়েই তারা ঘুরছেন এক স্কুলে থেকে অন্য স্কুলে। খোঁজ নিচ্ছেন নানা পছন্দের স্কুলের নিকট গিয়ে, কবে, কোথায় ভর্তি পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষায় পাসের জন্য কি কি বিষয়ে বাচ্চাদের পড়া তৈরী করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় তাদের ভাল রেজাল্টের জন্য আর কি কি করতে হবে। এবং সর্বশেষ যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে ভর্তি পরীক্ষায় না টিকে অন্য কোন উপায়ে ভর্তি করানো যায় কিনা ইত্যাকার নানা চিন্তা মাথায় মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অভিভাবকদের পরীক্ষা তো বাচচদের নয়; মনে হয় পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন গোটা অভিভাবকবর্গ।

আমার গবেষণাধীন এলাকা ঢাকা শহরের যে ৪টি হাইস্কুলের উপর জরিপ চালিয়ে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি আর মধ্যে ২টি সরকারী ও ২টি বেসরকারী হাই স্কুল ছিল। আবার গুনগত বিচারের দিকে খেয়াল রেখে ২টি অপেক্ষাকৃত ভাল হাইস্কুল এবং ২টি তুলনামূলক ভাবে কম ভাল হাইস্কুল নির্বাচত করেছি। তাছাড়া ৪টি হাইস্কুলের মধ্যে ২টি ছেলেদের এবং ২টি মেয়েদের ছিল। নিম্নে হাইস্কুল চারটির নাম ও উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সমস্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারেই তুলে ধরা হল।

১। মতিঝিল মডেল হাইস্কুল

২। মতিঝিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়

৩। সেগুন বাগিচা হাইস্কুল

৪। বেগম রহিমা আর্দশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চারটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষিকা এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যে সব সমস্যা কলেজ গুলোতে বিরাজ করছে তা এখানে বর্ণনা করা হল;

উপরোক্ত চারটি হাইস্কুলের মধ্যে মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের ছাত্র- ছাত্রীদের খেলাধূলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠের ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি স্কুলের ছাত্রী-ছাত্রীদের খেলাধুলা বাবদ সামান্য টাকা ব্যয় করে থাকে যা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। চারটি স্কুলই হলো অনাবাসিক। উপরোক্ত চারটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুল এলাকায় টিফিনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা ফুটপাতের খোলা খাবার খেয়ে থাকে। যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। স্কুল গুলোতে ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য, এমনকি শিক্ষকদের জন্যও পর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা নেই। শ্রেণীকক্ষ গুলোতে টেবিলের স্বল্পতা রয়েছে। পরিণামে এক টিবিলে অনেক ছাত্র- ছাত্রীকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়। ২/১ টি স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য তেমন কোন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেই। স্কুল গুলোতে ছোট একটি কক্ষের মধ্যে কিছু বই দেখতে পাওয়া গেছে। ছাত্র- ছাত্রীদের বসে পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বইয়ের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত বলে একসাথে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বই ধার নিতে পারে না। আবার গ্রন্থাগার গুলোতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের খুবই অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ছাত্র ছাত্রীরা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি স্কুলেই লক্ষ্যকরা গেছে যে, ছাত্র- ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা নগন্য। আবার বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন অনেক বেশী। স্কুল গুলোতে যে গবেষণাগার (Laboratory) রয়েছে সেখানেও উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর অনেক ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। আবার স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত বলে প্রতিবছর অনেক মেধাবী ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় বাদ পড়ে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চরমভাবে ভর্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়। মোটকথা, স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে। ঢাকা শহরের যে কোন স্কুলেই এ ধরনের সমস্যা বিদ্যমান বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন ফলপ্রসূ হতে হলে আগে কলেজ গুলোর সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান নির্ভর করে এই কলেজ গুলোর উপর। মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী সব শিক্ষার্থীর শতকরা ৮০ ভাগই এসব কলেজে পড়ে। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শোচনীয় হল এই কলেজগুলোর অবস্থা। ইতিহাসের কোন এক সন্ধিক্ষনে এই কলেজ গুলো তাদের কাম্য লক্ষ্য থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নানা ঐতিহাসিক কারণে এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অতি মাত্রায় সংকুচিত হয়।

ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে কলেজ শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় বৃটিশ কলেজগুলোর ধাঁচে । কিন্তু পরে এগুলো বৃটিশ ধাঁচে গড়ে ওঠেনি । এই কলেজ গুলো কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য গড়ে ওঠেনি। এই কলেজ গুলো কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে এমন বলা যায় না। বরং মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সব কাজের দায়িত্ব নেয়নি সেগুলোরই ভার এসে পড়ছে এই কলেজ গুলোর উপর। এদের সংখ্যা বেড়েছে সত্যি , কিন্তু তাতে শক্তি বাড়েনি, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য এদের নিয়ন্ত্রণ করেনি। এরা ভেসে চলেছে সময় ও ইতিহাসের টানে। ঢাকা শহরের নানা এলাকায় স্থানীয় জিদের বশে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিগ্রী কলেজ। যার ধারা এখন পর্যন্ত চলছে। এ সবই ছাপ রেখেছে এই কলেজ গুলোর প্রকৃতিতে।

বিশেষ করে পাকিস্তানী শাসনামলে, পূর্ব পাকিস্তানে কলেজগুলোর ক্রমাগত অবনতি ঘটতে লাগল। ঢাকায় ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর ইনটারমিডিয়েট স্তরের ভার দেওয়া হল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপর। প্রদেশের অন্যত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ইন্টারমিডিয়েট স্তর কলেজের অংশ হয়েই থাকল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রী

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স চালু হল এবং এই কোর্স উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য মাষ্টার্স ডিগ্রী কোর্স কমিয়ে এক বছর করা হলো। কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী কোর্স আগেরমত দুই বছরেরই রইল।

এইভাবে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কলেজ গুলো যেন সময়ের সঙ্গে ভেসে চলল। বাংলাদেশে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে মূল আদর্শ যে বিলেতের কলেজ তার সঙ্গে তাদের তফাত হয়ে দাঁড়াল অনেক।

১৯১৭-১৮ সালে বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ উভয়েরই লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। ডিগ্রী স্তরে ছাত্রের সংখ্যাও ছিল দু'জায়গায় প্রায় সমান। কিন্তু বিলেতে ২৬,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২,০০০ পড়ছিল বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল, আর ৪,০০০ পড়ছিল কলা। বাংলাদেশে অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। তাছাড়া বিলেতে ছিল আঠারটি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে তখনও ছিল মাত্র একটি।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার এক দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ হয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে গিয়ে দুটি অত্যন্ত পুরনো এবং ঐতিহ্যশালী কলেজকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ঢাকা কলেজ তার আশি বছরের ইতিহাসে এক গৌরবময় ঐতিহ্যগড়ে তুলেছিল। এই কলেজের অবনতির ফলে শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যেন হঠাৎ এক শূন্যতার সৃষ্টি হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় প্রথমে বলা হয়েছিল যে, ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রূপে স্নাতক স্তরে শিক্ষাদান করতে থাকবে। এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে ঢাকার কলেজ দু'টি তাদের পূর্বের মর্যাদা ফিরে পেল, কিন্তু পেলনা তাদের পূর্বের গৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

এটা দুঃখজনক যে, স্বাধীনতার ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন মর্যাদার আসন পাবার বদলে আরও পিছিয়ে পড়বে। কলেজ গুলো মারাত্মক আঘাত পেলো; একটি ছাড়া অন্য সব কলেজ থেকে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। ফলে ডিগ্রী স্তরে সত্যিকার জ্ঞান চর্চার সুযোগের অভাবে অধ্যাপকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। মোট ফল দাঁড়াল এই যে, স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ল। আমার গবেষণাধীন এলাকা ঢাকা শহরের ৪টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের উপর আমি জরিপ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তারমধ্যে ২টি সরকারী এবং ২টি বেসরকারী কলেজ ছিল। আবার গুণগত বিচারের দিকে খেয়াল রেখে ২টি অপেক্ষাকৃত ভাল কলেজ এবং ২টি অপেক্ষাকৃত কমভাল কলেজ নির্বাচিত করেছি। তাছাড়া ৪টি কলেজের মধ্যে ২টি ছিল ছেলে-মেয়েদের এবং ২টি ছিল মেয়েদের। নিম্নে কলেজ চারটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ;

১। নটরডেম কলেজ।

২। হাবীবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজ।

৩। শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়।

৪। সিদ্ধেশ্বরী গালর্স কলেজ।

উপরোক্ত চারটি কলেজের অধ্যক্ষ/ অধ্যক্ষা, প্রভাষক/ প্রভাষিকা এবং ছাত্র- ছাত্রীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যে সব সমস্যা কলেজ গুলোতে বিরাজ করছে তা এখানে বর্ণনা করা হলো ;

উপরোক্ত ৪টি কলেজের মধ্যে নটরডেম কলেজ ব্যতিত বাকী তিনটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত মাঠের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া যে সামান্য জায়গাটুকু রয়েছে তা উত্তরোত্তর খেলাধূলার অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখাশুনার অভাবে। প্রতিটি কলেজ খেলাধূলা বাবদ প্রতিবছর সামান্য টাকা ব্যয় করে থাকে যা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটেই যথেষ্ট নহে। নটরডেম কলেজ ব্যতিত বাকী তিনটি কলেজের কোন ছাত্রাবাস নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। নটরডেম

কলেজ ব্যতিত উপরোক্ত তিনটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের ব্যবস্থা নেই। ফলশ্রুতিতে অনেক দূরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কে টিফিন খেতে হয়। উপরোক্ত কলেজগুলোর ২/১ টি ছাড়া বাকী কলেজ গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লট ব্যবস্থা নেই। শ্রেণীকক্ষে টেবিলের স্বল্পতা রয়েছে। তাছাড়া এক ক্লাসে অনেক ছাত্র ছাত্রী বসতে হয় বলে অনেক সময় কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আবার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী বলে পিছনের দিকে যারা থাকে তারা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না এমন অভিযোগ ও রয়েছে। উপরোক্ত কলেজ গুলোতে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। কলেজ গুলোতে যে গ্রন্থাগার রয়েছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

অধিকাংশ গ্রন্থাগারে স্থানাভাবে অনেক ছাত্র- ছাত্রী এক সঙ্গে বসে পড়ালেখা করতে পারে না। তাছাড়া গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত বলে একসাথে প্রয়োজনীয় একই বই অনেকে গ্রন্থাগার থেকে ধার নিতে পারে না। আবার গ্রন্থাগার গুলোতে বিজ্ঞান বইয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই -ছাত্র ছাত্রীরা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি কলেজেই লক্ষ্য করা গেছে যে, ছাত্র - ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের হার কম। আবার কলেজগুলোর মধ্যে নটরডেম কলেজের ছাত্রদের বেতন অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে প্রায় ৪/৫ গুণ বেশী । প্রত্যেকটি কলেজের গবেষণাগারে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া কলেজ গুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত বলে প্রতিবছর অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পাচ্ছে না। অভিভাবকেরা মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের পর চরমভাবে ভর্তি সমস্যার সম্মূখীন হন। মোটকথা, কলেজগুলোতে হরেক রকমের সমস্যা বিরাজ করছে। এটি কেবলমাত্র ঢাকা শহরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে। সারা বাংলাদেশের কলেজ গুলোর অবস্থা খুবই করুণ।

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রী কলেজ

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তর হল ডিগ্রী পর্যায়। এ পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। এর প্রধান কারণ হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিবছর গড়ে শতকরা ৪০% ছাত্র পাস করে থাকে। যেমন, ১৯৯৭ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় পাসের হার সম্মিলিতভাবে ৩৯.৩৮%। তারপর এ সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কেউ কেউ মেডিক্যাল , ইঞ্জিনিয়ারিং, বি, বি, এ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। অবশিষ্ট ছাত্র- ছাত্রীরা কলেজে পাস কোর্স অথবা অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে থাকে।

বর্তমানে সারা দেশে ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। এর মধ্যে বিজ্ঞানে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার, বাণিজ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার এবং অবশিষ্ট কলা বিভাগে শিক্ষারত। অথচ সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে এটা মোটেই সুসামঞ্জস্য নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ আত্মঘাতি অবস্থা যে কোন সমাজের পক্ষে অপরিসীম দুশ্চিন্তার কারণ হতে বাধ্য।[১]

নিম্নে ডিগ্রী কলেজ গুলোর ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হল

প্রথমত ঃ কলেজ গুলোর গঠন ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় ডিগ্রী স্তরের সময়সীমা অন্ততঃ তিন বছর হওয়া দরকার। পা াত্য (বার বছরের স্কুল শেষে) ডিগ্রী স্তরের দৈর্ঘ্য তিন থেকে চার বছর। স্যাড্লার কমিশন এই উপমহাদেশের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার বছরের মাধ্যমিক স্তরের পর তিন বছরের ডিগ্রী স্তর সুপারিশ করেছেন। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন হুবহু একই সুপারিশ করেন। সেই বছরই জুলাই মাসে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয়। কিন্তু তারপর আবার পাস কোর্সের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দুই বৎসর করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নীতি ঘোষণা করে বলা হয় বিভিন্ন কলেজে তিন বছরের অনার্স কোর্সের ব্যবস্থাক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে।[২]

---

১ বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কুদরাত- এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৮৪

২ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, উচ্চ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, ১৯৬৮, পৃঃ ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি লক্ষ্য হতে পারে, কতগুলো কলেজে তিন বছরের অনার্স-কোর্স খোলার ব্যবস্থা করা। যে সব কলেজকে ইতিমধ্যেই উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া হয়েছে সেগুলোকেই এজন্য গ্রহন করা যেতে পারে। কোন কোন সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ইতিমধ্যেই কয়েক বিষয়ে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থা অন্যান্য কলেজে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ কলেজে গুলোর উন্নয়নের জন্য তাদের চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। অতীতে সাধারণতঃ ডিগ্রী কলেজ গুলো ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা ও দিয়েছে এবং নানা কারণে এই পরবর্তী স্তরই সমগ্র কলেজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। (১) ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই হয়েছে ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠ (প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ) এবং (২) ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের বেতনের ওপরই নির্ভর করেছে কলেজের আর্থিক স্বাচ্ছল্য।

শিক্ষাবিদ্‌রা বহুবার উল্লেখ করেছেন, কলেজগুলোর এই দো-আঁশলা চরিত্র ডিগ্রী স্তরের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং ইন্টারমিডিয়েট স্তরেরও যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষার্থীরা মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স যে সব কলেজে আছে সেখানে ক্রমে ক্রমে ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে পৃথক করে দেওয়া দরকার। এ সব কলেজে পাশাপাশি দুই বছরের ডিগ্রী স্তর থাকলেও এদের তিন বছরের ডিগ্রী স্তরের ওপরই জোর দেওয়া উচিৎ। যাতে কালক্রমে তারা এক বছরের মাস্টার্স কোর্স খুলতে পারে। স্যাডলার কমিশন ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন উভয়ই এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়- কেন্দ্রের সুপারিশ করেছেন।[৩]

---

৩ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, উচ্চ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, পৃ- ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রী কলেজ গুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যাটিও অত্যন্ত কঠিন। ডিগ্রী কলেজগুলো এদেশে উচ্চতর শিক্ষার সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে কখনো সুবিচার পায়নি বললেই চলে। ইন্টারমিডেয়েট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় তাদের শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় বরাদ্দের হিসেব দেখলেই সেটা বোঝা যাবে।

সারণী ঃ ৫.২

পাকিস্তানে কলেজ শিক্ষার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়

	ডিগ্রী কলেজ	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়
পূর্ব পাকিস্তান	১৮৮	১৯০	১,১৯৬
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৭০	৪৮০	৩,৩৬০

সূত্র ঃ উচ্চ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, পৃ- ৩০২

বলা বাহুল্য এই অসামঞ্জস্য নানা ঐতিহাসিক কারণের ফল। আর একটি কারণ হল ইন্টারমিডিয়েট স্তরের সঙ্গে অল্প সংখ্যক ছাত্র যোগ করে ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের পরিণাম দর্শিতা। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য কলেজ গুলোতে বর্ধিত হারে সরকারী সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে ডিগ্রী কলেজ গুলোর চাহিদা মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ না করা হলে অচিরেই কলেজগুলো ধ্বংসের সম্মুক্ষীন হবে।

আমি ঢাকা শহরের ৪টি ডিগ্রীর কলেজের উপর জরিপ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে ২টি সরকারী ও ২টি ছিল বেসরকারী কলেজ। আবার গুণগত বিচারের দিকে খেয়াল রেখে ২টি অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ২টি তুলনামূলকভাবে কম ভাল কলেজ নির্বাচন করেছি। তাছাড়া ৪টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ২টি ছিল ছেলেদের এবং ২টি ছিল মেয়েদের । নিম্নে কলেজ ৪টির নাম ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হলো;

১। ঢাকা কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

২। শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজ।

৩। সরকারী বেগম বদরুননেছা মহিলা মহাবিদ্যালয়।

৪। সেন্ট্রাল উইমেন কলেজ।

উপরোক্ত চারটি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ/ অধ্যক্ষা, প্রভাষক/ প্রভাষিকা, এবং ছাত্র- ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা সাপেক্ষে যে সব সমস্যা কলেজ গুলোতে লক্ষ্য করা গেছে নিম্নে তা প্রদান করা হলো। শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ এবং সেন্ট্রাল উইমেন কলেজে ছাত্র-ছত্রীদের খেলাধূলার জন্য কোন মাঠ নেই। আবার যে অর্থ খেলাধূলা বাবদ প্রতি বছর ছাত্র- ছাত্রীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয় তা খেলাধূলা খাতে ব্যয় করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ঢাকা কলেজ ব্যতিত বাকী তিনটি ডিগ্রী ও অনার্স কলেজে ছাত্র- ছাত্রীদের থাকার জন্য কোন আবাসিক হোষ্টেল নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা শহরে যাদের নিকট আত্মীয় স্বজন নেই তারা এই কলেজ- গুলোতে পড়া- লেখার সুযোগ পাচ্ছে না। আবার সেন্ট্রাল উইমেন কলেজ এবং শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাহিরের ধূলাবালিযুক্ত অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্টিন স্থাপনের দাবী জানিয়ে আসলেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। উপরোক্ত কলেজ গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। যে ২/৪টি টয়লেট রয়েছে তাহা ও দীর্ঘ দীন ধরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। তারপরও ছাত্র-ছাত্রীরা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রত্যেকটি কলেজে চেয়ার, টেবিল, এবং শিক্ষার উপকরণের অভাব রয়েছে। উপরোক্ত কলেজগুলোতে অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তাই জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ রয়েছে সরকারী- বেসবকারী উভয় কলেজেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য যে গ্রন্থাগার রয়েছে তা খুবই অপর্যাপ্ত। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মোতাবেক যে কোন ডিগ্রী কলেজের গ্রন্থাগারে যে পরিমাণ বই থাকার কথা উপরোক্ত কলেজ গুলোতে সেই পরিমাণ বই

Dhaka University Institutional Repository

নেই। তাছাড়া বইয়ের সংখ্যা সীমিত বলে একসঙ্গে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বই ইস্যু করে বাসায় নিতে পারে না। আবার গ্রন্থাগারে এক সঙ্গে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বসে পড়ার সুযোগ ও নেই। গ্রন্থাগারের ভেতর বিরাজ করছে এক ধরনের ভুতড়ে পরিবেশ। যা ছাত্র-ছাত্রীদের বসার অনুপযোগী। বই সরবরাহ করার জন্য গ্রন্থাগারে কর্মচারীর সাংখ্যা হলো মাত্র ১ জন। পরিণামে ছাত্র- ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বে শিক্ষকরা গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু করে নিয়ে যায়। আবার সরকারী কলেজের তুলনায় বেসরকারী কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ লক্ষ্য করা গেছে। উপরোক্ত ৪টি কলেজের মধ্য ঢাকা কলেজ ব্যতিত বাকী তিনটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গবেষণাগারে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানের ছাত্র- ছাত্রীদেরকে অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আবার কলেজ গুলোতে ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই সীমিত বলে বেসরকারী কলেজ গুলোতে শিক্ষকের বেতন দেওয়া অনেক সময় দুঃসাধ্য , হয়ে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে তারা ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ব্যাপারে বেশী আগ্রহ পোষণ করছে এবং নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাই ডিগ্রী -পর্যায়ে শিক্ষার মান নিম্নমানের হচ্ছে। তবে সরকারী কলেজের তুলনায় বেসরকারী কলেজে ব্যাপক সমস্যা বিরাজ করছে যা অর্থের অভাবে সমাধান কারা সম্ভব হচ্ছে না। উপরোক্ত সমস্যা গলো মূলত ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি কলেজেই কম-বেশী বিরাজ করছে। তবে গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে এই সমস্যা আরো প্রকট বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ শিক্ষা ও শ্রেণী ঃ জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ

সারণী ঃ ৫.৩

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

↓

শিক্ষাগত যোগ্যতা	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)	মোট	শতকরা (%)
প্রাথমিক	৭ (৩.৫)	২ (১)	০০(০)	৯	১.৫০
নিম্ন মাধ্যমিক	১৩(৬.৫)	৭ (৩.৫)	৩ (১.৫)	২৩	৩.৮৩ ১৪.৮৩
মাধ্যমিক	৩৩(১৬.৫)	৩৪ (১৭)	২২ (১১)	৮৯	২৭.৩৪
উচ্চ মাধ্যমিক	৪৭ (২৩.৫)	৪৮ (২৪)	৬৯ (৩৪.৫)	১৬৪	৩৪.৫০
স্নাতক	৬৬(৩৩)	৭৪ (৩৭)	৬৭ (৩৩.৫)	২০৭	১৮.০০
স্নাতকোত্তর	৩৪(১৭)	৩৫ (১৭.৫)	৩৯ (১৯.৫)	১০৮	১০০.০০
মোট	২০০(১০০)	২০০ (১০০)	২০০ (১০০)	৬০০	

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী- হতে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট ৬০০জন অভিভাবকের মধ্যে ১.৫% প্রাথমিক, ৩.৮৩% নিম্নমাধ্যমিক, ১৪.৮৩% মাধ্যমিক, ২৭.৩৪% উচ্চ মাধ্যমিক , ৩৪.৫% স্নাতক এবং ১৮% স্নাতকোত্তর। তবে আমার গবেষণাধীন হাই স্কুল , ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের ৬০০ জন অভিভাবকের মধ্যে নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নয়। তবে প্রায় ৫৩% অভিভাবকই সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। এবং তারা সকলেই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী । মাত্র ৫% অভিভাবকের প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঢাকা শহরে স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সকল অভিভাবকই মোটামোটি স্বশিক্ষিত। তাছাড়া প্রত্যেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের পড়ালেখার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন রয়েছে। যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের সকল অভিভাবকই শিক্ষিত তাই তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পাবে এটাই স্বাবাভিক ব্যাপার। একজন শিক্ষিত অভিভাবক তা পারে না। তাই অশিক্ষিত অভিভাবকরদের সন্তানরা ক্রমান্বয়ে স্কুল/ কলেজ পরিত্যাগ (Drop out) করতে থাকে। এই স্কুল/ কলেজ পরিত্যাগের সাথে তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও পাশাপাশি কাজ করে থাকে। সুতরাং, উপরের সারণী থেকেই স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, না পাওয়া নির্ভর করছে।

সারনী ঃ ৫.৪

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পেশা

↓

অভিভাবকদের পেশার ধরন	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)	মোট	শতকরা হার
সরকারী চাকরি	৬৭ (৩৩.৫)	৩৭ (১৮.৫)	৪৩ (২১.৫)	১৪৭	২৪.৫০
বেসরকারী চাকরি	৫৩ (২৬.৫)	৬১ (৩০.৫)	৬৭ (৩৩.৫)	১৮১	৩০.১৭
পেশাজীবী	৩১ (১৫.৫)	২৯ (১৪.৫)	৪১ (২০.৫)	১০১	১৬.৮৩
ব্যবসা	৪০ (২০)	৫৮ (২৯)	৩৭ (১৮.৫)	১৩৫	২২.৫০
অন্যান্য	৯ (৪.৫)	১৫ (৭.৫)	১২ (৬)	৩৬	৬.০০
মোট	২০০ (১০০)	২০০ (১০০)	২০০ (১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work.

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ জনের সরকারী চাকরি, ৩০ জনের বেসরকারী চাকরি, ১৭ জন পেশাজীবী (ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও অন্যান্য), ২৩ জন ব্যবসায়ী এবং ৬ জন অন্যান্য কাজে নিয়োজিত আছেন। তবে বেশীরভাগ অভিভাবকই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। আবার এমন অভিভাবক ও রয়েছেন যাঁদের চাকরির পাশাপাশি ছোট-খাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আবার শতকরা যে ৬ জন অভিভাবক অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ীওয়ালা। যারা মূলত বাড়ী ভাড়ার উপর ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

করে সংসার চালায়। তাঁদের অন্য কোন সম্পদ নেই। যেহেতু আমার গবেষণাধীন এলাকা মূলত ঢাকা শহর কেন্দ্রিক সেহেতু এখানে ৬০০ জন অভিভাবকের মধ্যে কেউই কৃষিজীবী নয়। সরকারী চাকরির মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে ১ম ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নেই। তাই সেই ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসরণ করা হয়েছে। পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী চাকরির অভাবে বেশীর ভাগ লোক বেসরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সরকারী কর্মচারী এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্যবসায়ী। তবে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ সরকারী চাকরি না পেয়ে বেসরকারী চাকরি এবং ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগের সাথে তাদের অভিভাবকদের পেশার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ অভিভাবকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ব্যতিত তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় ব্যয়ভার বহন করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তাই অভিভাবকরা কোন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে এবং সেই পেশায় তাদের মাসিক আয়ের উপরই তাদের সন্তানদের পড়ালেখা হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে।

সারণী ঃ ৫.৫

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মাসিক আয়

↓

মাসিক আয় (টাকায়)	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডেয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)	মোট	শতকরা হার
৪,০০০ পর্যন্ত	২৩ (১১.৫)	২৬ (১৩)	২৯(১৪.৫)	৭৮	১৩.০০
৪,০০১-৫,০০০	২৭(১৩.৫)	২৩(১১.৫)	২৬(১৩)	৭৬	১২.৬৭
৫,০০১-৬,০০০	৩৩(১৬.৬)	৪২(২১)	৩৫(১৭.৫)	১১০	১৮.৩৩
৬,০০১-৭,০০০	২৩(১১.৫)	২২(১১)	৩১(১৫.৫)	৭৬	১২.৬৭
৭,০০১-৮,০০০	২৪(১২)	১৭(৮.৫)	১৭(৮.৫)	৫৮	৯.৬৭
৮,০০১-৯,০০০	১৬(৮)	১৯(৯.৫)	১৪(৭)	৪৯	৮.১৬
৯,০০১ উর্ধ্বে	৫৪(২৭)	৫১(২৫.৫)	৪৮(২৪)	১৫৩	২৫.৫০
মোট	২০০(১০০)	২০০(১০০)	২০০(১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের মোট ৬০০ জন অভিভাবকের মধ্যে ১৩% এর আয় ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত। ৪,০০১-৫০০০ টাকার মধ্যে ১৩%, ৫০০১-৬,০০০ টাকার মধ্যে ১৮% , ৬০০১-৭,০০০ টাকার মধ্যে ১৩%, ৭,০০১-৮,০০০ টাকার মধ্যে ১০%, ৮,০০১-৯০০০ টাকার মধ্যে ৮% এবং ৯০০১ টাকার উর্ধ্বে আয় করে এমন অভিভাবক রয়েছে মোট ২৬%। এবং এরা সকলেই তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। আবার কেউ কেউ ছোট খাটো বেসরকারী কর্মচারী বা ছোট ব্যবসায়ী। ৫০০১ টাকা থেকে ৮০০০ টাকার মধ্যে যে সকল অভিভাবক রয়েছে তাদের মধ্যে মোটামুটি সকলেই ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদির লোক রয়েছে। ৮০০১ থেকে ৯০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করে এমন অভিভাবকের সংখ্যা প্রায় ৩৪ জন। তাদের সকলেই মোটামুটি ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকদার এবং বড় ব্যবসায়ী। এদের সকলের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিদ্যমান। অভিভাবকের মাসিক আয়ের সাথে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ যে সকল অভিভাবকের মাসিক আয় সর্বোচ্চ তাদের সন্তানরাই শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া তারা উন্নতমানের স্কুল/ কলেজে পড়া লেখার সুযোগ পাচ্ছে। আবার অভিভাবকদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে তারা একাধিক গৃহ শিক্ষকের নিকট পড়তে পারে। ফলশ্রুতিতে তাদের ফলাফল ও সন্তোষজনক হয়ে থাকে।

সারণী ঃ ৫.৬

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আবাসিক মর্যাদা

↓

মাসিক মার্যদা	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডেয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)	মোট	শতকরা হার
নিজস্ব বাড়ী	৭২ (৩৬)	৮৯(৪৪.৫)	৬২(৩১)	২২৩	৩৭.১৭
ভাড়াটে বাড়ী	১২৮ (৬৪)	১১১ (৫৫.৫)	১৩৮(৬৯)	৩৭৭	৬২.৮৩
মোট	২০০(১০০)	২০০(১০০)	২০০(১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মোট ৬০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৭% অভিভবকের আবাসিক মর্যাদা হলো তাদের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে ঢাকা শহরে। এবং ৬৩% উত্তরদাতার অভিভাবকের ঢাকা শহরে কোন বাড়ী নেই। তাদের আবাসিক মর্যাদা হলো তারা ভাড়াটে। এখানে আরো লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশী নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে তাদের সন্তানদের পড়ালেখার জন্যে বাসায় আলাদা জায়গা রয়েছে। মোট কথা তাদের পড়া লেখার জন্য উপযুক্ত স্থান রয়েছে। কিন্তু যে সব অভিভাবক ভাড়াটে হিসেবে থাকে তাদের বাসায় স্থানের অভাবে লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটে থাকে। তবে এটা সব ভাড়াটিয়াদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে। আবাসিক মর্যাদার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিজাত এলাকার সন্তানরা উন্নত মান-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে, যে সব অভিভাবক অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকায় বসবাস করে তাদের সন্তানদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশ প্রতিকূল ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সামাজিকী করনের অভাব ঘটে। তাই উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অনস্বীকার্য।

সারণী ঃ ৫.৭

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উত্তরদাতাদের অভিভাবকদের পরিবারের আয়তন

↓

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান→ পরিঃসঃসঃ↓	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডেয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)	মোট	শতকরা হার
৩ পর্যন্ত	৩ (১.৫)	২ (১)	৫ (২ .৫)	১০	১.৬৭
৪ - ৫	১৪৬ (৭৩)	১৫৭(৭৮.৫)	১৬০ (৮০)	৪৬৩	৭৭.১৭
৬-৭	৪৯ (২৪.৫)	৪০(২০)	৩০(১৫)	১১৯	১৯.৮৩
৮+	২(১)	১(.৫)	৫(২.৫)	৮	১.৩৩
মোট	২০০(১০০)	২০০(১০০	২০০(১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মোট ৬০০ টি পরিবারের মধ্যে ১.৬৭% এর সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৭৭.১৭% এর সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৭৭.১৭% এর সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯.৮৩% এর সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৭ জনের মত। আবার ১.৩৩% এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন বা তার চেয়ে বেশী। মোট কথা, ৪ থেকে ৫ জন সদস্য সংখ্যার মধ্যেই সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ। ঢাকা শহরে মুলত স্বামী- স্ত্রী এবং তাদের ২/৩ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ পরিবার সীমাবদ্ধ। এখানে একক পরিবারের সংখ্যা বেশী। গ্রামাঞ্চলে এর বিপরীতটা লক্ষ্য করা যায়। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজ। তাছাড়া ঢাকা শহরের অধিকাংশ জনগণই শিক্ষিত বলে তারা ছোটপরিবারের সুবিধা গুলো সহজে অনুধাবন করতে পারে। ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবারের আয়তন সীমিত রাখে। আবার ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি পরিবারের গৃহকর্ত্রী ও মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত বলে কম সন্তান গ্রহণে আগ্রহ পোষণ করে থাকে। এটি জনসংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের জন্য আশার বিষয়। হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সারণী ঃ ৫.৮

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উত্তরদাতাদের অভিভাবকদের
পরিবারের সদস্যদের বয়সসীমা এবং নির্ভরশীলতার ধরন

↓

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান → বয়স↓	হাইস্কুল (%)	শতকরা হার	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	শতকরা হার	ডিগ্রী কলেজ (%)	শতকরা হার	মোট	শতকরা হার
৪ পর্যন্ত	২৭১	১৮.৯৬	৩০১	১৯.৭৯	৩৮৭	২৪.১৭	৯৫৯	২১.০৭
৫-১৪ "	৪৯৬	৩৪.৭১	৫৫৮	৩৬.৬৯	৫৫৪	৩৪.৬০	১৬০৮	৩৫.৩৩
১৫-২৪"	৩৫৬	২৪.৯১	২৬৬	১৭.৪৯	২৬২	১৬.৩৬	৮৮৪	১৯.৪২
২৫-৩৪ "	১৮০	১২.৬০	২০৮	১৩.৬৮	২৪৪	১৫.২৫	৬৩২	১৩.৮৯
৩৫-৪৪"	৫৯	৪.১৩	১০৯	৭.১৭	৭৩	৪.৫৬	২৪১	৫.৩০
৪৫-৫৪"	২৪	১.৬৮	৪০	২.৬৩	৪৭	২.৯৪	১১১	২.৪৪
৫৫+	৪৩	৩.০১	৩৯	২.৫৫	৩৪	২.১২	১১৬	২.৫৫
মোট	১৪২৯	১০০.০০	১৫২১	১০০.০০	১৬০১	১০০.০০	৪,৫৫১	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাইস্কুল , ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়নরত মোট ৬০০টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা হলো ৪,৫৫৩ জন। তারমধ্যে ২১.০৬% হলো শিশু। জনবিজ্ঞানীদের মতে, ৫ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে যারা অবস্থান করছে তাদের সকলেই নির্ভরশীল জনসংখ্যা। সেই অনুসারে ৩৫.৩২% সদস্য সংখ্যা নির্ভরশীল। আবার ৫৫ বৎসরের উর্ধ্বে যারা অবস্থান করে তারাও নির্ভরশীল জনসংখ্যা সেই অনুসারে ২.৫৯% জনসংখ্যা নির্ভরশীল। আমার গবেষণাধীন জনসংখ্যার মোট ৩৭.৯১ লোক নির্ভরশীল। আবার ২১.০৭% শিশু জনসংখ্যা রয়েছে। তাই এটাও অনুন্নয়নের একটা প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। ৬০০টি পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারেই ১ অথবা ২ জন লোক কর্মরত রয়েছে। বাকী সকলেই নির্ভরশীল সদস্য।

সারণী ঃ ৫.৯

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অভিভাবকদের মাসিক ঋনের পরিমাণ (টাকায়)

↓

ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	ঋন গ্রহীতার সংখ্যা	শতকরা হার
৩০০০ পর্যন্ত	৭	১.১৭
৩০০১-৪০০০	৩	০.৫০
৪০০১-৫০০০	৯	১.৫০
৫০০১-৬০০০	১১	১.৮২
৬০০১-৭০০০	৪	০.৬৭
৭০০১-৮০০০	১	০.১৭
৮০০১-৯০০০	৭	১.১৭
৯০০১ +	৩১	৫.১৭
ঋনহীন অভিভাবক	৫২৭	৮৭.৮৩
মোট .	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে অভিভাবকদের মাসিক ঋনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। মোট ৬০০ জন অভিভাবকের মধ্যে ৭৩ জন অভিভাবক অন্যের নিকট থেকে কিংবা বিভিন্ন ঋনপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন গ্রহণ করেছে। বাকী ৫২৭ টি পরিবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন গ্রহণ করেনি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ ঋন বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋন গ্রহন করেনি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ ঋন গ্রহন করেছে এমন পরিবারের সংখ্যা ০.১৭% । যে সব অভিভাবক ঋণ গ্রহন করেছে তাদের অধিকাংশই স্বল্প বেতনের কর্মচারী বা ছোট ব্যবসা- প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাই পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত ভরন-পোষন, লেখাপড়া এবং অন্যান্যকারণে চড়াসুদে ঋন গ্রহণ করতে হয়েছে। এ সকল অভিভাবকদের ঋনের কারণে তাদের সন্তানদেরকে স্কুল/ কলেজ থেকে (drop out) হতে হচ্ছে।

সারণী ঃ ৫.১০

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অভিভাবকদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (টাকায়)

↓

ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	ঋন গ্রহীতার সংখ্যা	শতকরা হার
৩,০০০ পর্যন্ত	৬৭	১১.১৭
৩,০০১-৪,০০০	৩৭	৬.১৭
৪,০০১-৫,০০০	৪৩	৭.১৭
৫,০০১-৬,০০০	২৬	৪.৩২
৬,০০১-৭,০০০	৩৩	৫.৫০
৭,০০১-৮,০০০	৩৭	৬.১৭
৮,০০১-৯,০০০	৯৩	১৫.৫০
৯০০১ উর্দ্ধে	৯১	১৫.১৭
সঞ্চয়হীন অভিভাবক	১৭৩	২৮.৮৩
মোট	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field Work.

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, মোট ৬০০টি পরিবারের মধ্যে ৪২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ব্যাংকে অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে টাকা সঞ্চয় করে থাকে। এদের মধ্যে মাসিক সর্বনিম্ন সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪.৩২% যা মূলত ৫০০১-৬০০০ টাকার মধ্যে রয়েছে। আবার ৯,০০১ টাকার উর্দ্ধে সর্বোচ্চ সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৮.৮৩%। মাসিক ৯০০১ টাকার উর্দ্ধে যারা সঞ্চয় করে তাদের মধ্যে ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার , উকিল, বাড়ীর মালিক, বড় ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, অধ্যাপক ও অন্যান্য পেশার লোক রয়েছে। তাছাড়া ৩০০০ টাকা থেকে ৯০০০ টাকার মধ্যে যারা সঞ্চয় করে থাকে তাদের মধ্যে ছোট ব্যবসায়ী , শিক্ষক, তৃতীয় এবং চতুর্থ শেণীর কর্মচারী, বাড়ীর মালিক এবং অন্যান্য পেশার লোক রয়েছে। আবার এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের ২/১ জন সদস্য বিদেশে কর্মরত রয়েছে। অনেক অভিভাবকের আবার ২/১ জন ছেলে মেয়েও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ফলশ্রুতিতে তাদের আয়ের একটি অংশ পরিবারের ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করে থাকেন।

সারণী ঃ ৫.১১

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় সাহায্যকারী

↓

প্রতিষ্ঠানের নাম→ সহায়তাকারী ব্যক্তি↓	হাইস্কুল (%)	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (%)	ডিগ্রীকলেজ (%)	মোট	শতকরা হার
বাবা - মা	২৯ (১৪.৫)	৭ (৩.৫)	০ (০)	৩৬	৬.০০
ভাই - বোন	২১ (১০.৫)	৫ (২.৫)	০ (০)	২৬	৪.৩৩
গৃহ শিক্ষক	১৪৩ (৭১.৫)	১৬৯ (৮৪.৫)	১৭৩ (৮৬.৫)	৪৮৫	৮০.৮৩
অন্যান্য	৭ (৩.৫)	১৯ (৯.৫)	২৭ (১৩.৫)	৫৩	৮.৮৪
মোট	২০০ (১০০)	২০০ (১০০)	২০০ (১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field Work.

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়নরত মোট ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬% পড়া-লেখার ব্যাপারে বাবা-মার নিকট থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। তাদের বাবা-মা সবসময় পড়াশুনায় সহায়তা করে। ৪.৩৩% ছাত্র-ছাত্রী বড় ভাই-বোনের কাছ থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। ৮০.৮৩% ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার ব্যাপারে গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। বাকী ৮.৮৪% ছাত্র-ছাত্রী অন্যান্য উৎস থেকে পড়াশুনায় সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় $\frac{৪}{৫}$ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীল রয়েছে। আবার ডিগ্রী এবং ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে সাধারণত বাবা-মা সন্তানদেরকে একেবারেই সাহায্য করতে পারেন না। তাই কোচিং সেন্টার অথবা গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হন। কেউ কেউ আবার লজিং মাষ্টার বা আত্মীয় স্বজনকে বাসায় রেখে সন্তানদেরকে পড়ান।

সারণী ঃ ৫.১২

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষকের সংখ্যা

↓

প্রতিষ্ঠানের নাম	গৃহশিক্ষকের সংখ্যা				নাই	মোট
	১ জন	২জন	৩ জন	৪ জন এর উর্দ্ধে		
হাইস্কুল	৬৯	৬৬	১৪	১৩	৩৮	২০০
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	৮৭	৫১	৩৪	১১	১৭	২০০
ডিগ্রী কলেজ	১৫৪	১৪	৩	০	২৯	২০০
মোট	৩১০	১৩১	৫৯	২৪	৮৪	৬০০
শতকরা হার	(৫১.৬৭)	(২১.৮৩)	(৮.৫)	(৪.০)	১৪.০	

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে এটাই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মোট ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫৩.৫% মাত্র ১জন গৃহ শিক্ষকের নিকট পড়ে। ১৮.৫% ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২ জন করে গৃহ শিক্ষক রয়েছে। ৬.৫% ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩ জন গৃহশিক্ষক রয়েছে। আবার ১৯.১৭% ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কোন গৃহ শিক্ষক নেই। তাই তারা বাবা- মা- ভাই বোন এবং নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনের কাছে পড়ালেখার প্রয়োজনে সাহায্য নিয়ে থাকে। যাদের সাধারণত ৩/৪ জন গৃহশিক্ষক রয়েছে তারা প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক রাখেন। অনেক অভিভাবক আছেন যারা সারা বৎসরের জন্য গৃহশিক্ষক রেখে দেন। অনেকে আবার বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গৃহশিক্ষক রাখেন। তবে গৃহশিক্ষক রাখা , কিংবা না রাখা, কম সংখ্যক রাখা কিংবা বেশী সংখ্যক রাখা, সারা বৎসরের জন্য রাখা বা বৎসরের মাত্র কয়েক মাসের জন্য রাখা সবকিছুই নির্ভর করছে মূলত অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। যে অভিভাবকের যতবেশী আর্থিক স্বচ্ছলতা বিদ্যমান সে অভিভাবক তার সন্তানদের ততবেশী পড়ালেখার ব্যাপারে সুযোগ প্রদান করতে পারেন ফলশ্রুতিতে তার সন্তানের ভাল ফলাফলের নি য়তা রয়েছে।

সারণী ঃ ৫.১৩

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনার শতকরা হার

প্রতিষ্ঠানের নাম → বিষয় ভিত্তিক গৃহ শিক্ষক↓	হাই স্কুল N= 200	ই.মি. কলেজ N= 200	ডিগ্রী কলেজ N= 200
বাংলা	২৩.৫০	২৩.৩৭	১৬.১৪
ইংরেজী	২৬.৮৪	৩০.৮৮	১৯.৩১
গণিত	২৭.২৭	২৮.২৭	৪৩.৬৫
অন্যান্য	২২.৩৯	১৭.৪৮	২০.৯০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট ৬০০ জন ছাত্র- ছাত্রীর মধ্যে হাইস্কুল পর্যায়ে ২৩.৫০% বাংলায়, ২৬.৮৪% ইংরেজীতে, ২৭.২৭% গণিতে এবং ২২.৩৯% অন্যান্য বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ২৩.৩৭% বাংলায়, ৩০.৮৮% ইংরেজীতে ২৮.২৭ % গণিতে এবং ১৭.৪৮% অন্যান্য বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছে। ডিগ্রী পর্যায়ে ১৬.১৪% ছাত্র-ছাত্রী বাংলায়, ১৯.৩১% ইংরেজীতে , ৪৩.৬৫% গণিতে, ২০.৯০% অন্যান্য বিষয়ে পাস করেছে। তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমার প্রশ্নমালা যেহেতু বহু নির্বাচনী (multiple choice) ছিল সেহেতু একজন ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছে। তাছাড়া একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছে। তাই সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত উত্তর মোট ছাত্র সংখ্যার চেয়ে বেশী হয়ে যায় বলে আমি প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করে শতকরা হিসাব দেখতে বাধ্য হয়েছি। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ বাংলা ,ইংরেজী, গণিত, এই তিন বিষয়ে বেশী প্রাইভেট পড়ে থাকে।

সারণী ঃ ৫.১৪

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষকের জন্য মাসিক ব্যয় কৃত টাকার পরিমাণ

↓

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান→ মাসিক ব্যয়↓	হাইস্কুল	%	ইন্টারমিডি-য়েট কলেজ	%	ডিগ্রী কলেজ	%	মোট	%
১০০০ পর্যন্ত	১৭	১০.৪৯	৩১	১৬.৯৪	৩৩	১৯.৩০	৮১	১৫.৭০
১০০০১-২০০০	৫১	৩১.৪৯	৫৯	৩২.২৩	৮১	৪৭.৩৭	১৯১	৩৭.০২
২০০১-৩০০০	৩৯	২৪.০৭	৪৩	২৩.৫০	২৯	১৬.৯৬	১১১	২১.৫১
৩০০১-৪০০০	৩২	১৯.৭৫	২৯	১৫.৮৫	২১	১২.২৮	৮২	১৫.৮৯
৪০০১ উর্দ্ধে	২৩	১৪.২০	২১	১১.৪৮	৭	৪.০৯	৫১	৯.৮৮
মোট	১৬২	১০০	১৮৩	১০০	১৭১	১০০	৫১৬	১০০

উৎস ঃ Field Work.

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণী থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মোট ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী গৃহশিক্ষকের নিকট পড়ে। তন্মধ্যে ১৫.৭০% এর মাসিক গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় ১০০০ টাকা পর্যন্ত। ৩৭.০২% এর মাসিক গৃহ শিক্ষকের জন্য ব্যয় হয়েছে ১০০১-২০০০ টাকা পর্যন্ত। ২১.৫১% এর মাসিক গৃহশিক্ষকের জন্য ব্যয় হয়েছে ২০০১ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত। ১৫.৮৯% ছাত্র-ছাত্রীর মাসিক গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩০০১-৪০০০ টাকার উর্দ্ধে। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে সব অভিভাবকের মাসিক গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় ১০০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে তারা নিম্নবিত্ত। যাদের গৃহশিক্ষক বাবদ মাসিক খরচ ২০০১ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত তারা মধ্যবিত্ত এবং যে সব অভিভাবকের মাসিক গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় ৪০০১ টাকার উর্দ্ধে তারা উচ্চবিত্ত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত। উচ্চবিত্তের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক রয়েছে এবং তারা গোটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। উপরের সারণীতেও দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১০% লোকই উচ্চবিত্তের মধ্যে পড়ে এবং তাদের সন্তানরা শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, সমাজের একটি বৃহৎ অংশ উত্তরোত্তর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সারণী ঃ ১৫

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার ধরন

↓

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান→ প্রাইভেট পড়ার ধরন↓	হাই স্কুল	%	ই. মি. কলেজ	%	ডিগ্রী কলেজ	%
কমার্শিয়াল কোচিং সেন্টার	৫৩	৩২.৭২	৩৮	২০.৭৬	২৯	১৬.৯৬
গৃহ শিক্ষকের বাড়ীতে	৬১	৩৭.৬৫	৯৭	৫৩.০১	১১১	৬৪.৯১
ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ বাড়ীতে	৪৮	২৯.৬৩	৪৮	২৬.২৩	৩১	১৮.১৩
মোট	১৬২	১০০.০০	১৮৩	১০০.০০	১৭১	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাই স্কুল পর্যায়ে অধ্যায়নরত মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৬২ জন প্রাইভেট পড়ে থাকে। তন্মধ্যে ৩২.৭২% ছাত্র-ছাত্রী কর্মাশিয়াল কোচিং সেন্টার, ৩৭.৬৫% গৃহশিক্ষকের বাড়ীতে, ২৯.৬৩% ছাত্র-ছাত্রী নিজ বাড়ীতে প্রাইভেট পড়ে থাকে । আবার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নরত মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে থাকে। তন্মধ্যে ২০.৭৬% কর্মাশিয়াল কোচিং সেন্টার , ৫৩.১% গৃহশিক্ষকের বাড়ীতে, ২৬.২৩% ছাত্র-ছাত্রীদের নিজবাড়ীতে প্রাইভেট পড়ে থাকে। অনুরূপভাবে, ডিগ্রী পর্যায়ে অধ্যায়নরত ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে থাকে। তন্মধ্যে ১৬.৯৬% কমার্শিয়াল কোচিং সেন্টার, ৬৪.৯১% গৃহশিক্ষকের বাড়ীতে এবং ১৮.১৩% ছাত্র-ছাত্রীদের নিজবাড়ীতে পড়ালেখা করে থাকে। এখানে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, সকল পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানত গৃহশিক্ষকের নিকট গিয়ে বেশী পড়ে থাকে।

সারণী ঃ ৫.১৬

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরদের প্রাইভেট পড়ার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা

↓

প্রতিষ্ঠানের ধরন→ পরিবহণ↓	হাইস্কুল (%)	শতকরা হার	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	শতকরা হার	ডিগ্রী কলেজ	শতকরা হার	মোট	শতকরা হার
নিজস্ব গাড়ী	২৭	১৬.৬৭	৩৫	১৯.১৩	২৯	১৬.৯৬	৯১	১৭.৬৪
গণ পরিবহণ	১০৭	৬৬.০৫	১৩৭	৭৪.৮৬	১৩৪	৭৮.৩৬	৩৭৮	৭৩.২৬
পায়ে হেঁটে	২৮	১৭.২৮	১১	৬.০১	৮	৪.৬৮	৪৭	৯.১০
মোট	১৬২	১০০.০০	১৮৩	১০০.০০	১৭১	১০০.০০	৫১৬	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, হাইস্কুল পর্যায়ে ১৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে। তন্মধ্যে ১৭% নিজস্ব গাড়ী এবং ৬৬% গণ পরিবহণ এবং ১৭% পায়ে হেঁটে প্রাইভেট পড়তে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে। তন্মধ্যে ১৭% নিজস্ব গাড়ী , ৭৮% গণপরিবহন এবং ৫% পায়ে হেঁটে প্রাইভেট পড়তে যায়। যে ১৮% ছাত্র-ছাত্রী নিজস্ব গাড়ীতে

করে পড়তে যায়। সাধারণ তারা কম আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। নিজস্ব গাড়ীতে যাতায়াত করে বলে তাদের অনেক সময় বেঁচে যায়। ফলশ্রুতিতে সেই সময়টুকু তারা পড়ালেখা বা গণমাধ্যমে ভোগে ব্যয় করতে পার। কিন্তু যে সব ছাত্র-ছাত্রী গণ পরিবহণের মাধ্যমে গৃহশিক্ষকের বাড়ী পড়তে যায় তাদের রাস্তায় যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারণ লোকাল বাস, রিকশা, টেম্পো পেতে যথেষ্ট ঝামেলা সহ্য করতে হয়। তাই তাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে থাকে।

সারণী ঃ ৫.১৭

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার

↓

প্রাপ্ত নম্বরের হার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			মোট	শতকরা হার
	হাই স্কুল(%)	ইন্টারঃকলেজ (%)	ডিগ্রী কলেজ (%)		
অকৃতকার্য (৩২%) পর্যন্ত	৩১(১৫.৫%)	২১ (১৪.৫%)	২.৯ (১৪.৫)	৮১	১৩.৫০
৩য় শ্রেণী (৩৩%-৪৪%)	৫৩(২৬.৫)	৭৯(৩৯.৫)	৯৭(৪৮.৫)	২২৯	৩৮.১৭
২য় শ্রেণী (৪৫% -৫৯%)	৬৭ (৩৩.৫)	৬১ (৩০.৫)	৬৩(৩১.৫)	১৯১	১৬.৫০
১ম শ্রেণী (৬০%)	৪৯ (২৪.৫)	৩৯(১৯.৫)	১১(৫.৫)	৯৯	১৬.৫০
মোট	২০০(১০০)	২০০(১০০)	২০০(১০০)	৬০০	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৪% ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। ৩৮% ছাত্র-ছাত্রী স্কুল/ কলেজের পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৩২% ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ টেবিল এটাই প্রমাণ করে যে, ১ম বিভাগ ও অকৃতকার্যের সংখ্যা প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

কাছাকাছি। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। তবে সাধারণত হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও ডিগ্রী পর্যায়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগন্য। আবার এটাও সত্য, যে যত বেশী গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ছে এবং উন্নত স্কুলের গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ছে এবং উন্নত স্কুলে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষার সকল সুযোগ পাচ্ছে সে তত বেশী নম্বর পাচ্ছে। কারণ নম্বর পাওয়ার সাথে শিক্ষার সুযোগের সম্পর্ক রয়েছে।

সারণী ঃ ৫.১৮

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সফর ব্যবস্থা

↓

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান→ শিঃ সঃ ব্যবস্থা↓	হাই স্কুল%	ইঃ কলেজ %	ডিগ্রী কলেজ %	মোট	শতকরা হার
ব্যবস্থা আছে	১ (২৫%)	৩(৭৫)	৪ (১০০	৮	৬৬.৬৭
ব্যবস্থা নেই	৩ (৭৫%)	১(২৫)	০(০)	৪	৩৩.৩৩
মোট	৪ (১০০%)	৪(১০০)	৪(১০০)	১২	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট ১২টি হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ৬৭% স্কুল/ কলেজে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী ৩৩% স্কুল কলেজে আদৌ কোন শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা নেই। ঐ সব স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের আগ্রহের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সফরের সুযোগ থেকে প্রতিবছর বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণতঃ স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা একেবারেই নগন্য। যদিও বাংলাদেশের জনগনের স্বল্প মাথা পিছু আয় এবং বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকই আর্থিক অনটনে ভোগে তথাপিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা ও সকল ছাত্র-ছাত্রীর এবং সকল শিক্ষকের আগ্রহ থাকলেও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা মোটেই অসম্ভব নহে। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

কাছাকাছি। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। তবে সাধারণত হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে যথেষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও ডিগ্রী পর্যায়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগন্য। আবার এটাও সত্য, যে যত বেশী গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ছে এবং উন্নত স্কুলের গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ছে এবং উন্নত স্কুলে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষার সকল সুযোগ পাচ্ছে সে তত বেশী নম্বর পাচ্ছে। কারণ নম্বর পাওয়ার সাথে শিক্ষার সুযোগের সম্পর্ক রয়েছে।

সারণী ঃ ৫.১৮

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সফর ব্যবস্থা

↓

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান→ শিঃ সঃ ব্যবস্থা↓	হাই স্কুল%	ইঃ কলেজ %	ডিগ্রী কলেজ %	মোট	শতকরা হার
ব্যবস্থা আছে	১ (২৫%)	৩(৭৫)	৪ (১০০	৮	৬৬.৬৭
ব্যবস্থা নেই	৩ (৭৫%)	১(২৫)	০(০)	৪	৩৩.৩৩
মোট	৪ (১০০%)	৪(১০০)	৪(১০০)	১২	১০০.০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট ১২টি হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ৬৭% স্কুল/ কলেজে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী ৩৩% স্কুল কলেজে আদৌ কোন শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা নেই। ঐ সব স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বে প্রশাসনে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের আগ্রহের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সফরের সুযোগ থেকে প্রতিবছর বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণতঃ স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা একেবারেই নগন্য। যদিও বাংলাদেশের জনগনের স্বল্প মাথা পিছু আয় এবং বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকই আর্থিক অনটনে ভোগে তথাপিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা ও সকল ছাত্র-ছাত্রীর এবং সকল শিক্ষকের আগ্রহ থাকলেও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা মোটেই অসম্ভব নহে। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি প্রসার লাভ করে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকতর সচেতন বলে তারা নিজস্ব অর্থ, কলেজের অর্থ এবং এড সংগ্রহের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারে। ফলশ্রুতিতে তাদের শিক্ষা সফর সম্ভবপর হয় এবং শিক্ষা সফর সম্পর্কিত বিশেষ ম্যাগাজিন বের করা ও সম্ভবপর হয়ে থাকে।

সারণী ঃ ৫.১৯

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরদের শিক্ষা সফরের অর্থ সরবরাহ

↓

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান→ অর্থ সরবরাহ↓	হাইস্কুল	শতকরা হার	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	শতকরা হার	ডিগ্রী কলেজ (%)	শতকরা হার	মোট	শতকরা হার
নিজ অর্থ	১৫০	৭৫	১৫০	৭৫	০	০	৩০০	৫০
নিজের + স্কুল/ কলেজের অর্থ	৫০	২৫	৫০	২৫	২০০	১০০	৩০০	৫০
মোট	২০০	১০০	২০০	১০০	২০০	১০০	৬০০	১০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, হাই স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত ২০০জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৫% ছাত্র-ছাত্রী সম্পূর্ণ নিজ অর্থে শিক্ষা সফরে গিয়ে থাকে। বাকী ২৫% ছাত্র ছাত্রী নিজের এবং স্কুলের অর্থে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নরত মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৫% নিজ অর্থে এবং বাকী ২৫% নিজের এবং কলেজের অর্থে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করে থাকে। ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়নরত ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১০০% ছাত্র-ছাত্রীই নিজের এবং কলেজের অর্থে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করে । এ ব্যাপারে স্কুল/ কলেজের প্রধান শিক্ষক / প্রধান শিক্ষিকা এবং অধ্যক্ষ/ অধ্যক্ষার সাথে আলাপ আলোচনা করে জানা যায় যে, তাদের নিজস্ব কোন ফান্ড নেই বলে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে স্কুল/ কলেজ কর্তৃপক্ষ ও চায় যে, নিয়মিত প্রতিবৎসর শিক্ষা সফর হোক। কারণ শিক্ষা সফরের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.২০

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাই স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক (শিক্ষা , পেশা, আয়) অবস্থার তারতম্য

↓

স্কুলের নাম	শিক্ষাগত যোগত্য ডিগ্রী /তদুর্ধ	পেশা, উচ্চবিত্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী	অভিভাবকের মাসিক আয় ৩৫০০-১০,০০০তদুর্ধ	ছাত্রদের মাসিক ব্যয়	গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয়
মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৮	২৯	৩৭	১২৩১	১১৪০
বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	২৭	১৭	১৬	৬২১	৫৬০
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল	২১	৩৮	৩৫	১৫২৭	১২০০
সেগুন বাগিচা হাই স্কুল	২৪	১৮	২৩	৮২৫	১০৫০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এবং মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের পেশা, আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার ব্যয়, গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় সেগুন বাগিচা হাইস্কুল এবং বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী। শুধু এই চারটি স্কুল কেন সমগ্র ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুলের মাঝে এ ধরনের তারতম্য বিদ্যমান রয়েছে। পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এবং মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মোট ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের সকলেই উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা কিংবা বড় ব্যবসায়ী। যাদের মাঝে ১৯জন উচ্চ পর্যায়ের (সচিব, উপসচিব, পরিচালক, সহ পরিচালক, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কিংবা সমপর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের) কর্মকর্তা । ২৭ জন ১ম কিংবা ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা তথা অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল বা সমপর্যায়ের, ১৪জন ব্যবসায়ী, বাকী ৭ জনে ডিগ্রী পাশ, ৩৭ জন এম, এ পাশ এবং বাকী ১১জন পি, এইচ, ডি ও অন্যান্য ডিগ্রী ধারী। যাদের জনের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে ৩১ জনের মাসিক আয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে । ১৪ জনের মাসিক আয় ৩৫০০-৫,০০০ টাকার মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ঢাকা শহরের অন্য ২টি স্কুল বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও সেগুন বাগিচা হাইস্কুলের সামগ্রিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এক্ষেত্রে ঢাকা শহরের ৪টি স্কুলের, ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

সারণী ঃ ৫.২১

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টার মিডিয়েট পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক (শিক্ষা , পেশা, আয়) অবস্থার তারতম্য

↓

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিগ্রী /তদুর্ধ	পেশা, উচ্চবিত্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী	অভিভাবকের মাসিক আয় ৩৫০০-১০,০০০তদুর্ধ	ছাত্রদের মাসিক ব্যয়	গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয়
নটরডেম কলেজ	৩১	১৭	৫৭	১৫৭৫	১০২৫
হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ	২৬	১৫	২২	৯৮৪	৮৭২
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ	২৭	১৮	৩৫	১৩৮০	৭৯০
শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়	২৫	১০	৩০	৮৯৫	৬৬৫

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, নটরডেম কলেজ এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের পেশা, আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাখাতে ব্যয়, গৃহ শিক্ষক বাবদ ব্যয়, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ এবং শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী। তাই উপরোক্ত ৪টি কলেজ ছাড়াও ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজেও এধরনের তারতম্য বিদ্যমান। পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নটরডেম কলেজ এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের মোট ৩৫ জন অভিভাবকের সকলেই উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং বড় ব্যবসায়ী। অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, এদের সকলেই কমপক্ষে, ডিগ্রী বা তদুর্দ্ধ। পক্ষান্তরে, ঢাকা শহরের অন্য দুইটি কলেজ হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ এবং শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঢাকা শহরের উপরোক্ত চারটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ছাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র থেকে আরো স্পষ্টঃ হয়ে উঠে যে, শিক্ষার সুযোগ ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রভূত হচ্ছে এবং রাজধানী ঢাকা শহরেই তারতম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরো করুণ।

সারণী ঃ ৫.২২

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক (শিক্ষা , পেশা, আয়) অবস্থার তারতম্য

↓

ডিগ্রী কলেজের নাম	শিক্ষাগত যোগত্য ডিগ্রী /তদুর্ধ	পেশা, উচ্চবিত্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী	অভিভাবকের মাসিক আয় ৩৫০০-১০,০০০তদুর্ধ	ছাত্রদের মাসিক ব্যয়	গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয়
ঢাকা কলেজ	৩৬	৩৫	৩১	১৩৭৫	২,০০০
শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ	১১	১৩	১৭	৮৬৪	১৫০০
বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজ	৩৯	৩১	৩৩	১২৮৫	১২০০
সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ	২০	১৪	২৩	৯৭৫	১,০০০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ঢাকা কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের পেশা আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার ব্যয়, গৃহশিক্ষক বাবদ ব্যয় শেখ বোরহান উদ্দিন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ এবং সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের তুলনায় অনেক বেশী, উপরোক্ত চারটি কলেজ ছাড়াও ঢাকা শহরের অন্যান্য ডিগ্রী কলেজেও এ ধরণের তারতম্য বিদ্যমান, পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঢাকা কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজের মোট ৬৬ জন অভিভাবকের মধ্যে সকলেই উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং রঙ ব্যবসায়ী, অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, এদের সকলেই ডিগ্রী বা তদুর্ধ, পক্ষান্তরে ঢাকা শহরের অন্য ২টি কলেজে শেখ বোরহান উদ্দিন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে এবং সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঢাকা শহরের উপরোক্ত চারটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার আনুপাতিক তুলনামূলক চিত্র থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শিক্ষার সুযোগে ক্রমেই কেন্দ্রভূত হচ্ছে এবং রাজধানী ঢাকা শহরেই তারতম্য ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরো নাজুক।

সারণী ঃ ৫.২৩

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের হাই স্কুল পর্যায়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন

↓

ক্রমোচ্চ বিন্যাস	ছাত্র-ছাত্রীদের গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিম্ন	৪৮	২৪.০
মধ্য	৯৩	৪৬.৫
উচ্চ	৫৯	২৯.৫
মোট	২০০	১০০.০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে হাই স্কুল পর্যায়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের (media consumption) বা গণমাধ্যম ভোগের ধরন দেখানো হয়েছে। এখানে গণমাধ্যম বলতে প্রধানত রেডিও টেলিভিশন এবং সংবাদ পত্রকে বোঝানো হয়েছে। যে সকল অভিভাবক উপরের তিনটি গণমাধ্যমের যে কোন একটি ব্যবহার করে থাকে তাদের কে নিম্ন ; যে কোন দুইটি গণমাধ্যম ব্যবহার করে থাকলে মধ্যম এবং তিনটি গণমাধ্যম ব্যবহার করা হলে তাদেরকে উচ্চ হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে সাধারণত উত্তর হ্যাঁ হলে ১ (এক) এবং না হলে (০) শূন্য ধরা হয়েছে। সেই অনুসারে উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, ২৪% নিম্ন ও, ৪৭% মধ্যবিত্ত এবং ২৯% উচ্চ স্তরের মধ্যে অবস্থান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.২৪

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন

↓

শ্রেণীর ক্রমোচ্চ বিন্যাস	ছাত্র-ছাত্রীদের গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিম্নবিত্ত	৩১	১৫.৫
মধ্যবিত্ত	৭৭	৩৮.৫
উচ্চবিত্ত	৯২	৪৬.০
মোট	২০০	১০০.০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের (media consumption) বা গণমাধ্যম ভোগের ধরন দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৬% নিম্নবিত্ত, ৩৮% মধ্যবিত্ত এবং ৪৬% উচ্চবিত্ত রয়েছে। এখানে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে নিম্নবিত্ত এবং সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করছে উচ্চ বিত্ত। পূর্বের ন্যায় এখানেও গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের কে নিম্নবিত্ত যেসকল অভিভাবক ২টি গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদেরকে উচ্চবিত্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সারণী ঃ ৫.২৫

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ডিগ্রী পর্যায়ে অধ্যায়নরত
ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন

↓

শ্রেণীর ক্রমোচ্চ বিন্যাস	ছাত্র-ছাত্রীদের গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিম্নবিত্ত	২৯	১৪.৫
মধ্যবিত্ত	৬১	৩০.৫
উচ্চবিত্ত	১১০	৫৫.০
মোট	২০০	১০০.০

উৎস ঃ Field work

বিশ্লেষণ ঃ উপরোক্ত সারণীতে ডিগ্রী কলেজে অধ্যয়ণরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের গণমাধ্যম ভোগের ধরন দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৫% নিম্নবিত্ত, ৩০% মধ্যবিত্ত এবং ৫৫% উচ্চ বিত্তের মধ্যে অবস্থান করছে। এছাড়া এমন অনেক অভিভাবক রয়েছেন যাদের গণমাধ্যমে পাশাপাশি আরো অনেক জিনিষ রয়েছে যা ভোগ বিলাসের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এখানে ও গণমাধ্যম ব্যবহার করা হলে এক (১) এবং ব্যবহার না করা হলে মধ্যবিত্ত এবং তিনটি গণমাধ্যম ব্যবহার কর হলে মধ্যবিত্ত এবং তিনটি গণমাধ্যম ব্যবহার করা হলে উচ্চ বিত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ শিক্ষার সাথে পেশার সম্পর্ক

সারণী ঃ ৫.২৬

শিক্ষার সাথে পেশার সম্পর্ক

↓

পেশা শিক্ষা	সরকারী চাকুরী	বেসরকারী চাকুরী	পেশাজীবী	ব্যবসা	অন্যান্য	মোট
প্রাথমিক	০ (২.২১)	০ (২.৭২)	২ (১.৫২)	৪ (২.০৩)	৩ (.৫৪)	৯
নিম্ন মাধ্যমিক	৩ (৫.৬৪)	১২ (৬.৯৪)	০ (৩.৮৭)	৫ (৫.১৮)	৩ (১.৩৮)	২৩
মাধ্যমিক	১৩ (২১.৮১)	২৭ (২৬.৮৫)	৩৩ (১৪.৯৮)	১৪ (২০.০৩)	২ (৫.৩৪)	৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৮ (৪০.১৮)	৫২ (৪৯.৪৭)	১৯ (২৭.৬১)	৪৬ (৩৬.৯০)	৯ (৯.৮৪)	১৬৪
স্নাতক	৫৭ ৫০.৭২)	৬২ (৬২.৪৫)	৩১ (৩৪.৮৫)	৪৮ (৪৬.৫৮)	৯ (১২.৪২)	২০৭
স্নাতকোত্তর	৩৬ (২৬.৪৬)	২৮ (৩২.৫৮)	১৬ ১৮.১৮)	১৮ (২৪.৩০)	১০ (৬.৪৮)	১০৮
মোট	১৪৭	১৮১	১০১	১৩৫	৩৬	৬০০

$x^2 = ৭৪.৭৯$

HO = পেশার সাথে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= পেশার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক আছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জানি, যদি কাই বর্গের প্রত্যাশিত মান তার টেবিল মানের চেয়ে বড় বা সমান হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ২০ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান পরিগণিত মান ৭৪.৭৯অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহনযোগ্য নয়। সুতারাং শিক্ষার সাথে পেশার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

সারণী ঃ ৫.২৭

শিক্ষার সাথে আয়ের সম্পর্ক

↓

আয়→ পেশা↓	নিম্ন	মধ্যম	উচ্চ	মোট
সরকারী চাকুরী	২৪ (৩৭.৩৭)	৭৭ (৫৯.৭৮)	৪৬ (৪৯.৪৯)	১৪৭
বেসরকারী চাকুরী	৭১ (৪৬.৪৬)	৫৮ (৭৩.৬১)	৫২ (৬০.৯৪)	১৮১
পেশা	১৮ (২৫.৯২)	৫৩ (৪১.০৭)	৩০ (৩৪.০০)	১০১
ব্যবসা	৩১ (৩৪.৬৫)	৪৭ (৫৪.৯)	৫৭ (৪৫.৪৫)	১৩৫
অন্যান্য	১০ (৯.২৪)	৯ (১৪.৬৪)	১৭ (১২.১২)	৩৬
মোট	১৫৪	২৪৪	২০২	৬০০

নিম্ন => - ৫০০০ = ১৫৪

মধ্যম ৫০০০-৮০০০ = ২৪৪

উচ্চ => ৮০০১ + = ২০২

x^2 = ৪০.৩০

আমরা জানি, যদি কাইবর্গের নির্ণেয় মান তার টেবিল মানের চেয়ে বড় বা সমান হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হলে।

H_0 = পেশার সাথে আয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

H_1 = পেশার সাথে আয়ের সম্পর্ক আছে।

এখানে ৮ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান পরিগণিত মান ৪০.৩২ অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং আয়ের সাথে পেশার শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান।

সারণী ঃ ৫.২৮

পেশার সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক

↓

পরিবারের আয়তন→ পেশা↓	৩জন	৪-৫ জন	৬-৭ জন	৮+ জন	
সরকারী চাকুরি	৬ (২.৪৫)	১২২ (১১৩.৪৪)	১৫ (২৯.১৬)	৪ (১.৯৬)	১৪৭
বেসরকারী চাকুরী	২ (৩.০২)	১৪১ (১৩৯.৬৭)	৩৭ (২৯.১৬)	১ (২.৪১)	১৮১
পেশাজীবী	২ (১.৬৮)	৮১ (৭৭.৯৪)	১৭ (২০.০৩)	১ (১.৩৫)	১০১
ব্যবসা	০ (২.২৫)	৯৪ (১০৪.১৮)	৪০ (২৬.৭৮)	১ (১.১৮)	১৩৫
অন্যান্য	০(.৬০)	২৫ (২৭.৭৮)	১০ (৭. ১৪)	১ (.৪৮)	৩৬
মোট	১০	৪৬৩	১১৯	৮	৬০০

x^2 = ২৯.৪৪

HO = পেশার সাথে পরিবারের আয়তনের কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= পেশার সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি, যদি কাই বর্গের প্রত্যাশিত মান তার টেবিল মানের চেয়ে বড় বা সমান হয় তাহলে না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ১২ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০৫ ও .০১ সংশয় মাত্রায় আমাদের না সূচক অনুকল্প গ্রহণীয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পেশার সাথে পরিবারের আয়তনের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্ক নেই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্ক রয়েছে।

সারণী ঃ ৫.২৯

পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক

↓

গণমাধ্যম→ পেশা↓	নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট
সরকারী চাকুরী	৩২(২৬.৪৬)	৫৫ (৫৬.৬০)	৬০ (৬৩.৯৫)	১৪৭
বেসরকারী চাকুরী	৩৫ (৩২.৫৮)	৭২ (৩৮.৭৮)	৭৪(৭৮.৭৪)	১৮১
পেশাজীবী	১৭ (১৮.১৮)	৪৮(৬৯.৬৯)	৩৬(৪৩.৯৪)	১০১
ব্যবসা	১১ (২৪.৩)	৪৮(৩৮.৮৯)	৭৬(৫৮.৭৩)	১৩৫
অন্যান্য	১৩(৬.১৮)	৮ (৫১.৯৮)	১৫(১৫.৬৬)	৩৬
মোট	১০৮	২৩১	২৬১	৬০০

$x^2 = ২৭.৩৮$

HO = পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি, যদি কাই বর্গের প্রত্যাশিত মান তার টেবিল মানের চেয়ে বড় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ৮ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০৫ ও .০১ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ২৭.৩৮ অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৩০

শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের সাথে আয়ের সম্পর্ক

↓

আয়→ শিক্ষা↓	নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট
প্রাথমিক	৪(১.৬২)	৩(৩.৪৭)	২(৩.৯২)	৯
নিম্ন মাধ্যমিক	১১(৪.৪১)	৭(৮.৮৬)	৫(১০.০১)	২৩
মাধ্যমিক	১৮(১৬.০২)	৪৭(৩৪.২৭)	২৪(৩৮.৭২)	৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৩১(২৯.৫২)	৭৮(৬৩.১৪)	৫৫(৭১.৩৪)	১৬৪
স্নাতক	৩৮(৩৭.২৬)	৭১(৭৯.৭০)	৯৮(৯০.০৫)	২০৭
স্নাতকোত্তর	৬(১৯.৪৪)	২৫(৪১.৫৮)	৭৭(৪৬.৯৮)	১০৮
মোট	১০৮	২৩১	২৬১	৬০০

x^2 = ৭১.৮৮

HO = শিক্ষা এবং আয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= শিক্ষা এবং আয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমরা জানি, যদি কাই বর্গের প্রত্যাশিত মান তার টেবিল মানের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ১০ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ৭১.৮৮ অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং শিক্ষার সাথে আয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৩১

শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক

↓

পরিবারের আয়তন→ শিক্ষা↓	৩>	৪-৫	৬-৭	৮+	মোট
প্রাথমিক	০(.১৫)	৬(৬.৯৫)	২(১.২৯)	১(.১২)	৯
নিম্ন মাধ্যমিক	৩ (.৩৮)	১১(১৭.৭৫)	৬(৪.৫৬)	৩(০.৩১)	২৩
মাধ্যমিক	৪(১.৪৮)	৭১(৬৮.৬৮)	১৩(১৭.৬৫)	১৭(১.১৯)	৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৩(২.৭৩)	১০৭(১২৬.৫৫)	৫৩(৩২.৫৩)	১(২.১৯)	১৬৪
স্নাতক	০(৩.৪৫)	১৭২(১৫৯.৭৪)	৩৫(৪১.০৬)	০(২.৭৬)	২০৭
স্নাতকোত্তর	০(১.৮)	৯৬(৮৩.৩৪)	১০(২১.৪২)	২(১.৪৪)	১০৮
মোট	১০	৪৬৩	১১৯	৮	৬০০

$x^2 = ৯১.৪৭$

HO = শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তনের কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= শিক্ষা সাথে পরিবারের আয়তনের সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি, যদি কাই বর্গের প্রত্যাশিত মান যদি তার টেবিল মানের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ১৫ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ৯১.৪৭ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং প্রকল্পটি গ্রহনযোগ্য নহে। সুতরাং শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৩২

শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক

↓

গণমাধ্যম→ শিক্ষা↓	নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট
প্রাথমিক	৪(১.৩২)	৩(৩.৪৭)	২(৩.৩২)	৯
নিম্ন মাধ্যমিক	৮(৪.১৬)	৭(৮.৮৬)	৮(১০.০১)	২৩
মাধ্যমিক	১৯(১৬.০২)	৩৫(৩৪.২৭)	৩৫(৩৮.৭২)	৮৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৩১(২৯.৫২)	৭৮(৬৩.১৪)	৫৫(৭১.৩৪)	১৬৪
স্নাতক	৩৩(৩৭.২৬)	৮৮(৭৯.৭)	৮৬(৯০.০৫)	২০৭
স্নাতকোত্তর	১৩(১৯.৪৪)	২০(৪১.৫৮)	৭৫(৪৬.৯৮)	১০৮
মোট	১০৮	২৩১	২৬১	৬০০

$x^2 = ৪৮.২৮$

HO = শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক নেই।

H_1= শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি, যদি কাই- বর্গের প্রত্যাশিত মান যদি তার টেবিল মানের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ১০ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ৪৮.২৮ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৩৩

আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক

↓

আয়→ গণমাধ্যম↓	নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট
নিম্ন	২৩(২৭.৭২)	৭৮(৫৯.২৯)	৫৩(৬৬.৯৯)	১৫৪
মধ্য	৩৬(৪৩.৯২)	১২৮(৯৩.৯৪)	৮০(১০৬.১৪)	২৪৪
উচ্চ	৪৯(৩৬.৩৬)	২৫(৭৭.৭৭)	১২৮(৮৭.৮৭)	২০২
মোট	১০৮	২৩১	২৬১	৬০০

$x^2 = ৮৮.৩৭$

HO = আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক নেই।

H_1= আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি, যদি কাই- বর্গের প্রত্যাশিত মান যদি তার টেবিল মানের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ৪ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ৮৮.৩৭ অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৩৪

আয়ের সাথে গৃহ শিক্ষকের সংখ্যার সম্পর্ক

↓

গৃহ শিক্ষকের সংখ্যা→ আয়↓	০	১	২	৩	৪+	মোট
নিম্ন	৩৮ (২১.৫৬)	৬৭ (৭৯.৫৭)	২৮ (৩৩.৬২)	১৮ (১৩.০৯)	৩ (৬.১৬)	১৫৪
মধ্য	৩২ (৩৪.১৬)	১৩৮ (১২৬.০৭)	৫৫ (৫৩.২৭)	১০ (২০.৭৪)	৯ (৯.৭৬)	২৪৪
উচ্চ	১৪ (২৮.২৮)	১০৫ (১০৪.৩৭)	৪৮ (৪৪.৭০)	২৩ ১৭.১৭	১২ (৪.০৪)	২০২
মোট	৮৪	৩১০	১৩১	৫১	২৪	৬০০

$x^2 = ৫১.০৯$

HO = আয়ের সাথে গৃহ শিক্ষকের সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই।

H_1= আয়ের সাথে গৃহ শিক্ষকের সংখ্যার সম্পর্ক রয়েছে ।

আমরা জানি, যদি কাই- বর্গের প্রত্যাশিত মান যদি তার টেবিল মানের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের না সূচক অনুকল্প বাতিল হবে। এখানে ৪ স্বাধীনতা মাত্রায় এবং .০০১ ও .০০৫ সংশয় মাত্রায় x^2 এর টেবিলমান প্রাপ্তমান ৫১.০৯ অপেক্ষা ছোট। তাই প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং আয়ের সাথে গৃহশিক্ষকের সংখ্যার সম্পর্ক রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু সব শিশুর জীবনে শিক্ষার এই অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কথা উঠলেই বলা হবে, দেশ দরিদ্র, সম্পদ নেই। তাই সমগ্র সমাজের বিশাল অংগন জুড়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে অশিক্ষার অন্ধকার।

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর শুধু সুযোগ নয়, এটি তার জন্মগত অধিকারও বটে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এই বাণীটি বাংলাদেশের সংবিধানে শুধু স্থান পেয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, 'একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকা কে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহতি হবে এবং এই শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতি পূর্ণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।"

১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার নিয়ে ৩৬,৬৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী করণ করা হয়। গণমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে গঠিত হয় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। কিন্তু বাস্তব চিত্র হচ্ছে স্বাধীনতার ২৫ বৎসর পরও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ৭৮ লাখ শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ও বাড়বে।

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সামাজিকীকরণের একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দু'ভাবেই হতে পারে। মার্কসবাদীরা শিক্ষাকে সমাজের উপরি কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আবার জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার শিক্ষাকে মর্যাদা লাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মার্কস অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পত্তির মালিকানা বা অমালিকানার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকে নির্ধারণ করার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে, ওয়েবার ক্ষমতার উৎস হিসেবে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকের প্রতি দৃষ্টি প্রদান না করে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সামাজিক মর্যাদার একটি অন্যতম পরিমাপক হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। বর্তমান গবেষণায় শিক্ষা ও শ্রেণীর তাত্ত্বিক আলোচনা, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও সমাজ কাঠামোগত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিক্ষার সাথে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সম্পর্কের তারতম্য রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি কিন্ডার গার্টেন, টিউটোরিয়াল হোম, প্রি-ক্যাডেট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত স্কুলের পারস্পরিক পরিবেশ, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার ব্যয়ের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে।

আমি ঢাকা শহরের যে মাধ্যমিক, ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কলেজগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার সুযোগের সাথে শিক্ষার ফলাফলের ও তারতম্য রয়েছে। অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে শিক্ষার সুযোগের তারতম্য এবং শিক্ষার সুযোগের সাথে ফলাফলের পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং দেখা যায় যে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী যেমন, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা তথা তাদের পরীক্ষার ফলাফল এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরের বাড়ীওয়ালা ও বাড়াটিয়ার আর্থিক অবস্থা, জমির পরিমাণ, শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সন্তানদের শিক্ষার সুযোগের পার্থক্য ও পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, শহরের অবস্থাপন্ন শিল্পপতিও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর সন্তানেরা শিক্ষার অধিকতর সুযোগ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, শিক্ষার উপকরণের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে এক বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে শিক্ষার সুযোগ ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। আর সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণায় ঢাকা শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জরীপ চালিয়ে জানা যায় যে, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, উপযুক্ত পরিবেশ, গৃহশিক্ষকের অভাব, শিক্ষার উপরকরণের উর্ধ্বমূল্য ইত্যাদি কারণে ভাল ফলাফল সম্ভব হচ্ছে না। আমার ধারণা বাংলাদেশের সকল শহরাঞ্চলে এসব সমস্যা কমবেশী বিদ্ধমান।

আমার গবেষণায় জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহকে আমি কাই বর্গের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি। সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, আমার গবেষণার প্রকল্পসমূহ প্রমাণের জন্য প্রাপ্ত ফলাফল X^2 -এর টেবিলমান অপেক্ষা বড়। তাই প্রকল্পগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ শিক্ষার সাথে পেশা, পেশার সাথে পরিবারের আয়তন, পেশার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন, শিক্ষার সাথে আয়ের, শিক্ষার সাথে পরিবারের আয়তন, শিক্ষার সাথে গণমাধ্যম ব্যবহারের, আয়ের সাথে গণমাধ্যম ব্যবহার এবং আয়ের সাথে গৃহশিক্ষক নিয়োগের সম্পর্ক রয়েছে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশী শক্তিশালী সেই দেশ তত উন্নত এবং সামাজিক শ্রেণীগুলো মর্যাদাশীল। তাই বাংলাদেশকে এক-টি সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জি

ক) বাংলা সূত্র

সরকারী সূত্র

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান, ১৯৭২

২. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪।

৩। বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্ট্রাটিসটিক্যাল রিপোর্ট, ১৯৯৬

আধা-সরকারী সূত্র ঃ

৪। বি, আই, ডি, এস, গ্রাম, জরিপ, ১৯৮৮

৫। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৩

৬। কুদরাত -এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট , ১৯৯৬

৭। উচ্চ শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ১৯৮২

৮। শিক্ষা ও পরিকল্পনা , বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ১৯৮১

গৌণ সূত্র ঃ

৯। ডঃ অতুল সুর, শিক্ষাপীঠ কলকাতা, কলকাতা, জ্যোৎস্নালোক, ১৯৮৯

১০। অনুপম সেন, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, সামাজিক অর্থনীতির স্বরুপ, ঢাকা, সাহিত্য সমবায়,

১১। অরুন সোম, সমাজ বিদ্যা (রুশ ভাষা থেকে বংগানুবাদ), মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৭

১০। আ, ভ-রাত- লিকভ, ইয়েমার্কোভা, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮

১১। জেমস টেলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, বাংলা একাডেমী ,১৯৭৮

১২। নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, শিক্ষা দীক্ষা, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৫৯।

১৩। নিতাই দাস, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬

১৪। নিতাই দাস, বাংলাদেশে শিক্ষা আন্দোলন, ঢাকা, জনা দাস, ১৯৮৯

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, কালিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১

১৬। ডঃ রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

১৭। বাংলাদেশ লেখক শিবির সম্পাদিত , বাংলাদেশের শিক্ষা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, ঢাকা, বাংলাদেশ লেখক শিবির, ১৯৯০

১৮। বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল, কলকাতা, অরুনা প্রকাশনী, ১৮৭৯

১৯। বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্যুৎ সমাজ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭

২০। ভ, ই, লেলিন, সংকলিত রচনাবলী, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ২য় খন্ড, ১৯৭৭

২১। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শিক্ষা ও শ্রেণী, ঢাকা, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৯৮৭

২২। শামসুল হক, শিক্ষা প্রসংগ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

২৩। ডঃ শাহজাহান তপন, থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল, ঢাকা, প্রতিভা, ১৯৯৭

২৪। স্যামুয়েল কোনিগ, (অনুবাদ ঃ রংগলাল সেন), সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা, প্যারামাউন্ট বুক করপোরেশন, দ্বিতীয় সংস্কারন, ১৯৭৫

২৫। সতেন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৩৮৯

২৬। সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৭

B) English Sources

Governmental sources

1. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical pocket book of Bangladesh, 1996

Dhaka University Institutional Repository

2. GOP. (Ministry of Education), Report of the Commission of National Education, Govt. of Pakistan, Karachi, 1961.

3. GOB (Ministry of Finance), Demands for Grants and appropriation, Non Development, 1995-96.

International Sources

4. United Nationas, Measures for the Economic Development of underdevelopment countries, 1951.

5. UNESCO, Relevance of Education of Ruarl development , Statistical Year Book, 1996.

6. UNESCo, Statistical Year Book, 1995.

7. UNESCO, Statistical Year BooK, 1994.

8. World Bank, Education Sector Policy Papers, Washington D. C. 1980.

9. World Bank, Report; Washington D. C., 1995

Secondary Sources (Books and Journals)

10. V. Afanasyv, Marxist Philosophy, Moscow, Progress Publishers, 1963.

11. Aparna Basu, The Growth of Education and political Development in India 1898-1920, Delhi, Oxford University Press, 1974.

12. Hamza Alavi, The State in Post-colonial Societies, New Left Review, 1972.

13. Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset (ed), Class Status and Power, Gleneco, The Free Press, 1957.

Dhaka University Institutional Repository

14. Henry Bernstein, Underdevelopment and Development The Third World Today, Harmords Worth, Penguin Books, 1973.

15. M. Blaug, (ed), Economics of Education, Penguin, Modern Economics, 1965.

16. Edward Bleshin, (Ed), Blonds Encyclopedia of Education, Blonds Education Limited, 1969.

17. T.B. Bottomore, Marxist Sociology, London, MacMillan, 1975.

18. T.B. Bottomore, Classes in Modern Society, London, George Allen and Unwin, 1970.

19. T.B. Bottomore, Sociology, a Guide to Problems and Literature, London, George Allen and Unwin, 1971.

20. W.A. Brookover, Sociology of Education, American Sociological Review, Vol. 14, 1949.

21. John Browelt, Out of Dependency Perspective, Journal of Contemporary Asia, Vol. 12, No.2, 1982.

22. F. J. Brown, Educational Sociology, New York, Printince Hall, 1947.

23. William M. Cave and A. Chesles Marx, Sociology of Education, New York, MacMillan Publishing Co. 1974.

24. Catherine Court, (ed), Basic Concept in Sociology, Great Britain, Chulmate and Edward Publishers, 1987.

25. Allison Davis, Social Class Influence upon Learning, Cambridge, Harvard University Press, 1957.

Dhaka University Institutional Repository

26. Emile Durkheim, Education and Sociolgy, New York, The Free Press, 1968.

27. Encyclopaedia of Americana, Groleer Incorporated International Head Quarters, Doberry, 1983.

28. A.G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Lation America, New York, Monthly Review PRESS, 1969.

29. Anthony Giddens, Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge, University Press, 1984.

30. Anthony Giddens, Politics and Sociology in the thought of Max Weber, London, MacMillan Press, 1978.

31. Anthony Giddens, The Class Structure of the Advanced Societies, Boston, Hayman, 1981.

32. Morris Ginsberg, Reason and Unreason in Society, London, MacMillan Press, 1947.

33. Jullius Gould and William L. Kolb, (ed), A Dictionary of Social Science, Great Britain, Tavistock Publication, 1964

34. F. Harbison and C.A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, New York, MacGraw Hill, 1964.

35. Md. Shirajul Haq, Drop out in Primary Schools, Dhaka, Dhaka University Publishers, 1961.

36. W.L. Hansen, Education, Income and Human Capital, New York, Nationl Bureau of Economic Research, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

37. S. Sazzad Hossain, Education in Progress (ed), East Pakistan Education Week, Dhaka, The Star Press, 1968.

38. R.M. Hutchins, Education for Freedom, Louisiana, University Press, 1957.

39. Denis Lawton, Social Class, Language and Education, New York, Schoken Books, 1965.

40. David Lehmann (ed), Development Theory for Critical Studies, London, MacMillan Press, 1979.

41. V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 6, 29, Moscow, Progress Publishers, 1977.

42. Karl Lowith (ed), Max Weber and Karl Marx, London, George Allen and Unwin, 1982.

43. Stephen Lukes, Emile Durkheim, His life and works, Hormonds Worth, Penguin,1975.

44. Karl Mannheim, Man and Society in an age of Reconstruction, London, Routledge and Kegan Paul, 1940.

45. Karl Mannheim and W.A. C. Stewart, An Introduction to the Sociology of Education, London, Routledge and Kegan Paul, 1962.

46. Karl Marx and F. Engels, Selected Correspondence, New York, International Publishers, 1942.

47. Karl Mark and F. Engels, Manifesto of the Communist Party, Moscow, Progress Publishers, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

48. Karl Marx, Collected Works, Vol. 6, Moscow, Progress Publishers, 1979.

49. Michael Man (ed), MacMillan Students Encyclopaedia of Sociology, London, MacMillan Press, 1983.

50. Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, London, Weidenfield and Nicolson, 1969.

51. Ivor Morish, The Sociology of Education, London, George Allen and Unwin, 1978.

52. P.W. Musgrave, The Sociology of Education (Methon and Co. Ltd.) 1969.

53. James, Petras, The Peripheral State : Continuity and Changes in the Internationl Division of Labour, Journal of Contemporary Asia, Vo.2 No. 4 ,1982.

54. R. Redfield, The Little Community (Chicago), 1955.

55. J.S. Saul, The State in Post Colonial Societies, The Socialist Register Melen Press,1974.

56. J.R. Sheffield, Education, Employment and Rural Development, Nairobi, 1967.

57. S.G. Strumilen, The Economic Significance of People Education, U.S.S.R.,-1962.

58. D.F. Swift, The Sociology of Education, London, Routledge and Kegan Paul, 1979.

Dhaka University Institutional Repository

59. J.W. Tibble, The Study of Education, London : Routledge and Kegan Paul, 1967.

60. Merrit M Thompson, The History of Education, New York : Bernet and Noble, 1951.

61. M. P. Todero, Economic Development in the Third World, Hydrabad, Orient Longman, 1985.

62. D.J. Vide, The School and Society, New York : University of Chicago Press, 1900.

63. V.I., Volkov, A Dictionary of Political Economy, Moscow Progress Publishers, 1985.

64. Immanual Wallerstein, The Modern World System, New York : Academic Press, 1974.

65. Kamal siddiqui and etal, Social Formation in Dhaka City, Dhaka University press limited, 1990.

66. Kirsten, Westergard, "The State; A Review of Some theorical issue" : Journal of Social Studies, No. 13, Dhaka, 1981.

67. Max Weber, Economy and Society, New York : Bedminister Press, 1968.

68. Max Weber, General Economic History, New York : Collier Books, 1961.

69. Max Weber, Essays in Sociology, (ed) Gerth and C.W.Mills London, Routledge and Kegan Paul, 1948.

70. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Tr. by Talcott Parsons with a forward by R.H. Tawnery, New York, Scribner, 1956.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা

সামাজিক শ্রেণী ও শিক্ষা ঃ ঢাকা শহরের কতিপয় স্কুল ও কলেজের উপর একটি সমীক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ পত্র

১। শিক্ষার্থীর নামঃ .....

২। অধ্যয়নরত স্কুল/ কলেজের নামঃ .....

৩। শ্রেণী ঃ .....

৪। অভিভাবকের নাম ঃ .....

৫। অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ .....

৬। পেশা ঃ ..... ৭। পদবী ঃ .....

৮। অভিভাবকের বাৎসরিক আয় ঃ .....

৯। আয়ের উৎসঃ .....

বিভিন্ন খাত থেকে আয়	টাকার পরিমাণ
বাড়ী ভাড়া	
ব্যবসা	
চাকুরী	
অন্যান্য উৎস	

১০। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিবরণ ঃ .....

সদস্য সংখ্যা	উত্তরদাতার সঙ্গে	লিঙ্গ	বয়স	পেশা/পদবী	আয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.							
২.							
৩.							
৪							

Dhaka University Institutional Repository

১১। আপনারা কোথায় থাকেন ? নিজের বাড়ী / ভাড়াটে বাসা

১২। কোন এলাকায় বসবাস করেন.....

১৩। পরিবারের আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয় .....

১৪। পরিবারের কি কোন সঞ্চয় থাকে কিংবা ধার করতে হয় ?

১৫। আপনার অভিভাবক পড়াশুনায় সহযোগিতা করেন কি ? হ্যাঁ / না

১৬। উত্তর হ্যাঁ হলে কে কে করেন : বাবা / মা/ বড়ভাই / বড়বোন/ অন্যান্য

১৭। কিভাবে সহযোগিত করেনঃ.....

১৮। শিক্ষার্থীর পড়াশুনার জন্য পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা আছে কি না ঃ হ্যাঁ/ না।

১৯। শিক্ষার্থীর কোন গৃহ শিক্ষক আছে কিনা ঃ হ্যাঁ / না

২০। হ্যাঁ হলে ..... জন এবং না হলে কেন ঃ .....

২১। কোন্ কোন্ বিষয়ের গৃহশিক্ষক আছেন : .....

২২। গৃহ শিক্ষক এসে পড়ান, নাকি তাঁর বাসায় গিয়ে পড়তে হয় ঃ .....

২৩। আপনি কি কোন কোচিং সেন্টারে পড়তে যান ? হ্যাঁ / না

২৪। কোচিং সেন্টারে কিভাবে যান ঃ রিক্শা / নিজস্ব গাড়ী / বাস ইত্যাদি।

২৫। বিগত পরীক্ষায় আপনি গড়ে কত শতাংশ নম্বর পেয়েছেন ঃ .....

২৬। প্রাথমিক / জুনিয়র বৃত্তি পেয়েছেন কিনা ? হ্যাঁ/ না

২৭। উত্তর হ্যাঁ হলে বৃত্তির টাকা দিয়ে আপনি কি করেন ঃ .....

২৮। পড়াশুনায় মাসিক সর্বমোট ব্যয় কত ?

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত শিক্ষার উপকরণ ও অন্যান্য	টাকার পরিমাণ
১.	বই পত্র ক্রয়	
২.	খাতা- কলম কেনা	
৩.	টিফিন খাওয়া	

Dhaka University Institutional Repository

৪.	যাতায়াত ভাড়া	
৫.	গৃহশিক্ষকের বেতন	
৬.	স্কুল কলেজের ফি	
৭.	কোচিং সেন্টার ফি	
৮.	অন্যান্য	

২৯। আপনি পড়াশুনার বাইরে অন্যান্য সময় কিভাবে কাটান ? .....

কাজের পরিমাণ (দৈনিক)	সময় ঘন্টায়
পড়ালেখা	
পাঠ্য বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ের বই পুস্তক পড়া শুনার	
খেলাধূলায়	
বাবা- মাকে গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করে	
গৃহ শিক্ষকতায়	
টেলিভিশন/ ভি,সি, আর দেখে	

৩০। আপনি দেশ-বিদেশে ভ্রমনের জন্য কতদিন কাটান ঃ .....

৩১। স্কুল/ কলেজে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা আছে কিনা ? হাঁ / না

৩২। উত্তর হ্যাঁ হলে শিক্ষা সফরে কতদিনের জন্য গিয়েছেন ঃ ..... দিন।

৩৩। শিক্ষা সফরে কত টাকা ব্যয় করেছেন ঃ ..... টাকা। স্কুল/ কলেজ থেকে ..... টাকা। নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন ..... টাকা

৩৪। আপনার অভিভাবক খবরের কাগজ পড়েন কি ? হ্যাঁ / না ?

৩৫। আপনার অভিভাবক টিভি দেখেন এবং রেডিওএর অনুষ্ঠান শুনেন কি ? হ্যাঁ / না।

৩৭। আপনার অন্য কোন সমস্যা থাকলে বলুন ঃ .....

Dhaka University Institutional Repository

Anneure- 1

Strategic Framework of Basic Education in Bangladesh

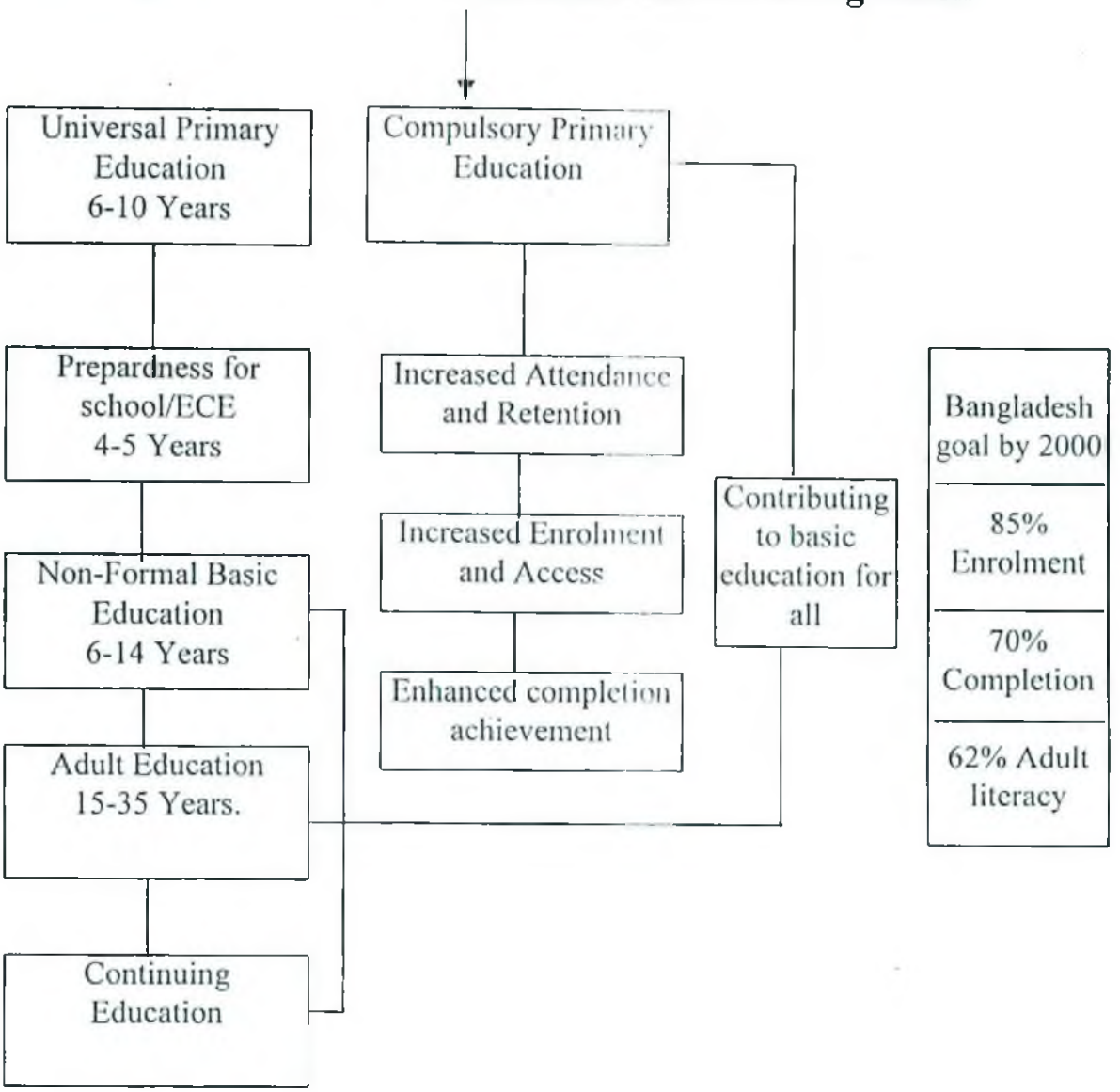

Source : Selected Facts, PMED, GoB.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure–2

Social Mobilization for EFA

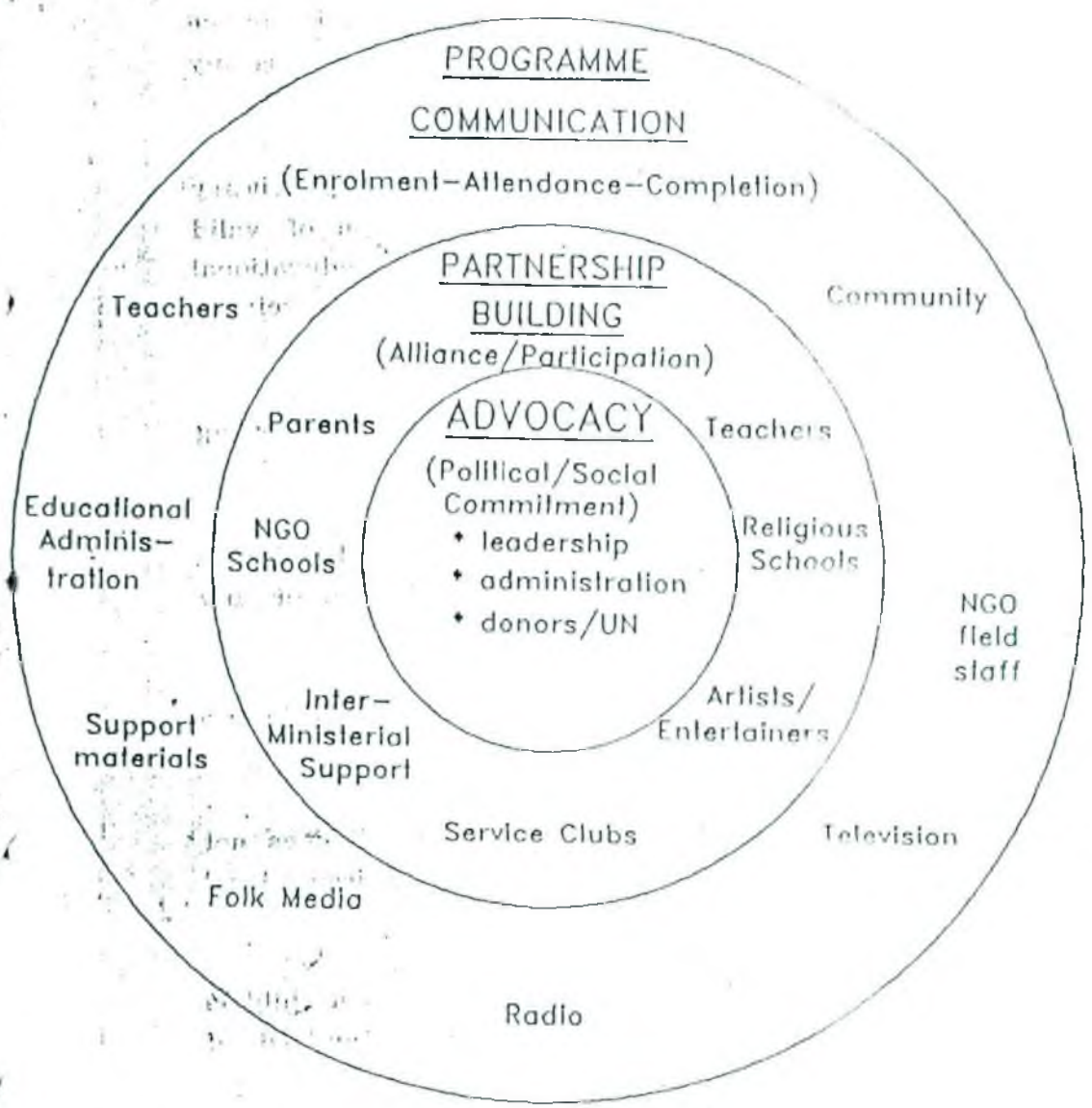

Source: Education for All:
Social Mobilization. National Conference, April 30, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 3

Compulsory Primary Education Act.

Clause 3 of the CPE Act gives the substance of the Act. English translation of the clasue is given below.

3. Introduction of Compulsory Primary Education.
   (1) The Government, by notification in the official gazette, may introduce Compulsory Primary Education in any part of the country from any date.
   (2) Every guardian, residing within the area where Compulsory Primary Education may be introduced, shall, with the exception of valid reasons, get each child admitted into a primary level educational institution near his place of residence for the purpose of receiving primary education.
   (3) Valid reasons, mentioned in sub-clause (2), shall mean the following reasons, viz.,
      (a) if, does not become possible to get a child admitted into a primary level educational institution due to illness or any other unavoidable circumstance;
      (b) if, there is no primary level educational institution within two kilometers from the child's place of residence;
      (c) if, inspite of filling an application for admission, it does not become possible to get a child admitted into any primary level education institution;
      (d) if, in the opinion of the Primary Education Officer, a child is already receiving education equivalent to the standard of primary education;
      (e) if, in the opinion of the Primary Education Officer, it is undesirable to admit a child into any primary level educational institution on account of the child's mental deficiency.
   (4) No person, within the area where Compulsory Primary Education may be introduced, shall engage any child in any activity deterrent to the child's attendance at a primary level educational institution for receiving education.

Source : The Dhaka Gazette (Extra-Ordinary), February 13, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 4

Literacy Situtation in Neighbouring and South East Asian Countries.

Name of the Country	Population (m)	Rate of Literacy (%)
Bangladesh	123.4	35.3
Bhutan	.6	38.0
Burma	44.3	81.0
Cambodia	8.7	48.0
China	1181.8	73.3
India	884.6	52.1
Indonesia	188.4	81.5
Laog	4.3	83.9
Malaysia	18.4	78.5
Maldives	.2	98.2
Nepal	20.2	26.0
Pakistan	122.8	35.0
Philippines	61.2	93.5
Singapore	3.1	91.0
South Korea	44.1	96.0
Sri Lanka	17.7	88.5
Thailand	58.6	93.0
Vietnam	71.0	88.0

Source :Task Force on Primary and Mass Education : Report, December, 1993 (quoted from Asia Week, 11/08/93).

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 5

Age-group Population of Bangladesh

(in million)

Year	All Ages		6-10 Years		6 Years	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female
1990	107.515	52.241	16.679	8.144	3.543	1.757
1991	109.900	53.400	17.020	8.310	3.618	1.793
1992	112.219	54.538	17.350	8.471	3.691	1.828
1993	114.508	55.650	17.645	8.629	3.763	1.862
1994	116.443	56.596	17.912	8.760	3.823	1.890
1995	118.667	57.683	18.255	8.912	3.92	1.923
1996	120.874	58.762	18.564	9.208	3.961	1.955
1997	123.026	59.814	18.863	9.208	4.028	1.986
1998	125.105	60.831	19.150	9.348	4.092	2.016
1999	127.119	61.816	19.424	9.482	4.154	2.045
2000	129.127	62.799	19.697	9.615	4.216	2.074
2001	131.103	63.766	19.964	9.746	4.277	2.102

(in million)

Year	4-5 Years		11-14 Years		15-45 Years		15 + Years	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female
1990	7.154	3.576	10.553	4.979	46.184	22.783	59.949	30.552
1991	7.296	3.644	10.713	5.065	47.565	23.461	61.577	31.566
1995	7.806	3.887	11.257	5.369	52.928	26.101	67.789	35.537
2000	8.397	4.160	11.838	5.709	59.800	29.482	75.570	40.757

Note : 1) Population estimated for 1991 of different age groups on the basis of census report of 23 districts over total population.

Dhaka University Institutional Repository

2) Age-group population for the projected years are estimated based on the variation of ratio of age group population between 1981 and 1991 census data and then regression estimate on the ration of age-group population over the projected years.

3) Total population by sex for the projected years are calculated based on the estimates of population growth reported by PDEU Planning Commission.

Source : Education for All : National Plan of Action, PMED, GOB.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 6

Number of Pre-primary Education Centers run by integrated Non-formal Euducation Programme and other Agencies/ Organisations (NGOs), 1993

Working Area		Total No. of Centers	Teachers		Students
District	Thana		Male	Female	
Munshiganj	Srinagar	15	-	15	450
Narayanganj	Sonargaon	30	-	30	900
Narsingdi	Polash	30	6	24	900
Jamalpur	Melandaha	15	6	9	450
Kishoreganj	Sadar Thana	15	-	15	450
Madaripur	Kalkini	30	9	21	900
Rajbari	Goalundo	15	10	5	450
Rajshahi	Tanore	15	6	9	450
Nawabganj	Shibganj	15	3	12	450
Pabna	Ishwardi	15	9	6	450
Bogra	Sibganj	15	-	15	450
Jaypurhat	Sadar Thana	15	4	11	450
Gaibandha	Sadullapur	30	-	30	900
Dinajpur	Biral	30	-	30	900
Coxs Bazar	Chakaria	15	8	7	450
Rangamati	Sadar Thana	15	9	6	450
Feni	Daganbhuiya	15	3	12	450
Comilla	Brahmanpara	30	-	30	900
Comilla	Laksam	15	2	13	450
Chandpur	Sadar Thana	15	-	15	450
Brahmanbaria	Kasba	15	8	7	450
Sylhet	Golapganj	15	6	9	450
Moulbibazar	Srimangal	15	9	6	450
Khulna	Fultala	15	2	13	450
Jhenaidah	Sailkupa	15	-	15	450
Kushtia	Mirpur	15	1	14	450
Chuadanga	Alamdanga	15	-	15	450
Patuakhali	Sadar Thana	15	-	15	450
Jhalakati	Sadar Thana	15	6	9	450
Total		525	107	418	15750

Source : BANBEIS, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 7

EFA NETWORK IN BANGLADESH

The World Conference on Education for All in March 1990 had participation of non-government organisations side with 155 governments. The conference had 3 principal objectives :

- To highlight the importance and impact of basic education and renew commitment to make it available to all;
- To forge a global consensus on a framework for action to meet the basic learning needs of children, youth and adults;
- to provide a forum for sharing experience and research results to invigorate ongoing and planned programmes.

However, there has not been any definite mechanism of follow-up of the conference outcome and the momentum gained at the world conference could not be sustained at the individual country level. Thus there was an organizational gap in the Education for all movement. However, in Bangladesh, at the initiatives of the NGOs, a new EFA-Network has been established as apartners in development -the government, the non-government organisations and the donors,were all brought together on one platform. The government is taking up new programmes, the donors are allocating new funds and the NGOs are taking new initiatives toward achievement of EFA goals and objectives. New partners in development are joining this new Network to achieve the set objectives.

At the initiatives of the said NGO initiated network, a South-East Asia Regional Consultation on Education for All was organized in Dhaka in February, 1992, Eight countries of the region participated in the Consultation. These are Afghanistan, Bangladesh, Bhutaqn, India, Nepal, Pakistan, Maldives and Sri Lanka. The objectives of the Regional Consultation, among others, were to sustain the debate and exchange information and expand the Network with new partners and to develop a plan for sustaining action at the regional level.

Source : Education for All : National Plan of Action, PMED, GOB.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 8

NON- FORMAL PRIMARY EDUCATION THE BRAC EXPERIENCE

Being poor and being female stand in the way of millions in acquiring basic education in Bangladesh. Combating low enrolment and dropouts in the present primary education system is adaunting task but it is by no means hopeless. BRAC model of Non-Formal Primary Education (NFPE) for children of 8-10 years age group and the model of Primary Education for Older Children (PEOC) of 11-16 years age group are innovative efforts that have been successful in addressing the problems of low enrolment, low attendance and high dropouts. Criteria for selecting villages where school will be located include parent demands, availability of teachers, students and proximity to a cluster of villages. Relevant curricula, dedicated and well supervised teachers, reasonable class size and parent involvement have important parameters in making this school a success.

70% of the students are girls belonging to the most disadvantaged rural families. Classes are conducted for an average of 270 days a year and more than 95% of the learners complete the 3 year school term of NFPE and over 90% of the graduates move on to the government schools in classes IV and V. The programme hs a system of participatory and decentralized management in which the Programme Organizer (Po) is the first line field personnel and directly supervises 15-20 schools. They assist the teachers to work with parent meetings and conduct monthly teachers training session. Pos are in turn supervised by the learning, rather than pasive recipients of

Dhaka University Institutional Repository

information. Curriculum is relevant to rural life and such provisions as card games, rhymes, mimes, wall newspapers, group reading side by side with co-curricular activities like singing, dancing, games, story telling, etc., make the teaching learning environment more interesting which ensures high attendance.

The stress on comprehension rather than memorizing, no fear of formal examination and practically no homework are some of the special features of the school curricula. Class size is seldom bigger than 30 students and more than 85% of the teachers are women. Thje selected teachers are given a short term basic training followed by monthly referesher courses.

Community has full involvement in management of the school, with only 22 schools in 1985 there are over 11,000 schools throughout Bangladesh today. BRAC plans to expand that number to 50,000 schools by 1995. The cost per chid (1992) is Taka 822 per year or Taka 2,466 per course in which 36% is attributable to teachers cost, 36% for books and supplies and 28% for supervision and management. BRAC believes in the motto, "Try something, enlarge on what works, change what does not work improve what needs improvement and replicte what is effective".

Source : Education for All: National Plan of Action, PMED, GOB.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 9

INTEGRATED DEVELOPMENT AND ERADICATION OF ILLITERACY SWANIRVAR WAY

Swanirvar thana educator Iqbal Chowdhury visited the village Naya Haola under Daulatkhan thana in Bhola for the first time in April 1989. The primary school children and a few shopkeepers helped him to get in touch with some young men in the village who listened to Iqbal about Swanirvar philosophy of self-reliance and what they could possibly themselves do to improve their condition without waiting for government help. As a natural urge for betterment was there, it did not require too much effort for Iqbal to arrange with the help of those motivated young people to have meeting of a large cross section of the villagers, form five socio-economic committees of farmers, landless, youth, women and people of different vocational groups, form a village development Committee of 12 members taken from those 5 groups and put them in charge of agricultural development, health & family planning, education, cottage industries and so on. They completed the village survey, prepared a 'Gram Boi' (Village Book) and drew up a simple village development plan. Each group began small savings and started to work on self-help basis. In a short time besides planting 5619 trees, starting a number of small poultry and livestock projects, completing 88 bore hole latrines, 4 slab latrines, 9 tubewells, immunizing 30 mothers and 91 infants, they were able to make one bridge, 4 bamboo culverts and construct 5 km of dirt road, re excavate10 ponds and started fisheries in all the 34 ponds in the village. They managed to get the Bangladesh Krishi Bank to disburse Tk.

Dhaka University Institutional Repository

180,000 Swanirvar Credit (literacy and acceptance of a family planning method are amongst conditions of eligibility for the loan) to 100 landless people while 137 others got small loans out of the group's own savings of Tk. 186,093 for income generating investments. However, of all such works, what the inhabitants of Swanirvar Naya Haola village were proud of were there 5 literacy centers. The result of such integrated multisectoral development was that within 48 months, they were able to raise the contraceptive prevalence rate to 62% and the overall literacy rate to 66% while making 100% working age adults literate and creating employment opportunity for 237 individuals from the total 220 landless families in the village. But Naya Haola was not the only village which benefitted lide that. Between 1978 and 1991, as a part of its Total village vevelopment Programme (TVD) in 138 thans Swanirvar Bangladesh was able to make 97179 people free from the ignominy of using thump impression, make 389978 people literate in addition to 30000 adults who were made literate under the MEP programme of the government. Under the Non-formal Primary Educationm Programme of the GEP of the government, Swanirvar Bangladesh has undertaken to make 20573 school age children complete their 5- year primary school education through 80 non-formal schools at an annual cost of Tk. 690 per child. Experience has taught Swanirvar Bangladesh that in order to obtain the best results it is advisable to interlink meaningfully related sectoral development programme, specially income generation, family planning & primary health and literacy.

Source : Education for All : National Plan of Action, PMED, GOB.

Dhaka University Institutional Repository

Annexure- 10

Transforming Disadvantaged Children into Productive Human Resource

Empirical study analyzing the life situation of poor children living in urban slums led to the birth of the underprivileged children's Educational programs (UCEP) two decades ago. Rapid increase in migration of the rural poor to the urban areas forces poor young children, boys and girls, to remain on the street, engage themselves in hard physical labour to support themselves and their families suffer exploitation and abuse. They have no social life and no enlightenment. UCEP schools addresses the educational and vocational training needs of those children for improving their economic and social conditions, provide them basic education, vocational training and employment support. The features of UCEP include the following.

- UCEP schools are located where the working children are concentrated;
- UCEP curriculum for basic education is comparable with that of normal public schools.
- UCEP teachers are specially trained to be able to take up 'social work' and they ensure that attendance is over 85% and annual drop out does not exceed 5%.
- Irregular students are specially monitored;
- UCEP provides all educational materials, books and stationery free of cost;

Dhaka University Institutional Repository

- Child centered teaching method keeps the environment attractive;
- 3-year basic education is followed by one year education preparatory to vocational training which is followed by another 1-3 years training is developing marketable skills;
- UCEP maintains linkages with prospective employers particularly in industry, for future placement of the children.

The positive experiences of UCEP led to sizable expansion of the programme in major cities of Bangladesh, Dhaka, Chittagong and Khulna. In 1993 more than 12,000 children are participating in UCEP general education and vocational training in one session. This number is going to increase to 18,000 by 1996, and besides increasing coverage in the existing cities, it will be extended to also Rajshahi.

Source : Education for All : National plan of Action, PMED, GOB.

Dhaka University Institutional Repository

MAPS OF DHAKA CITY

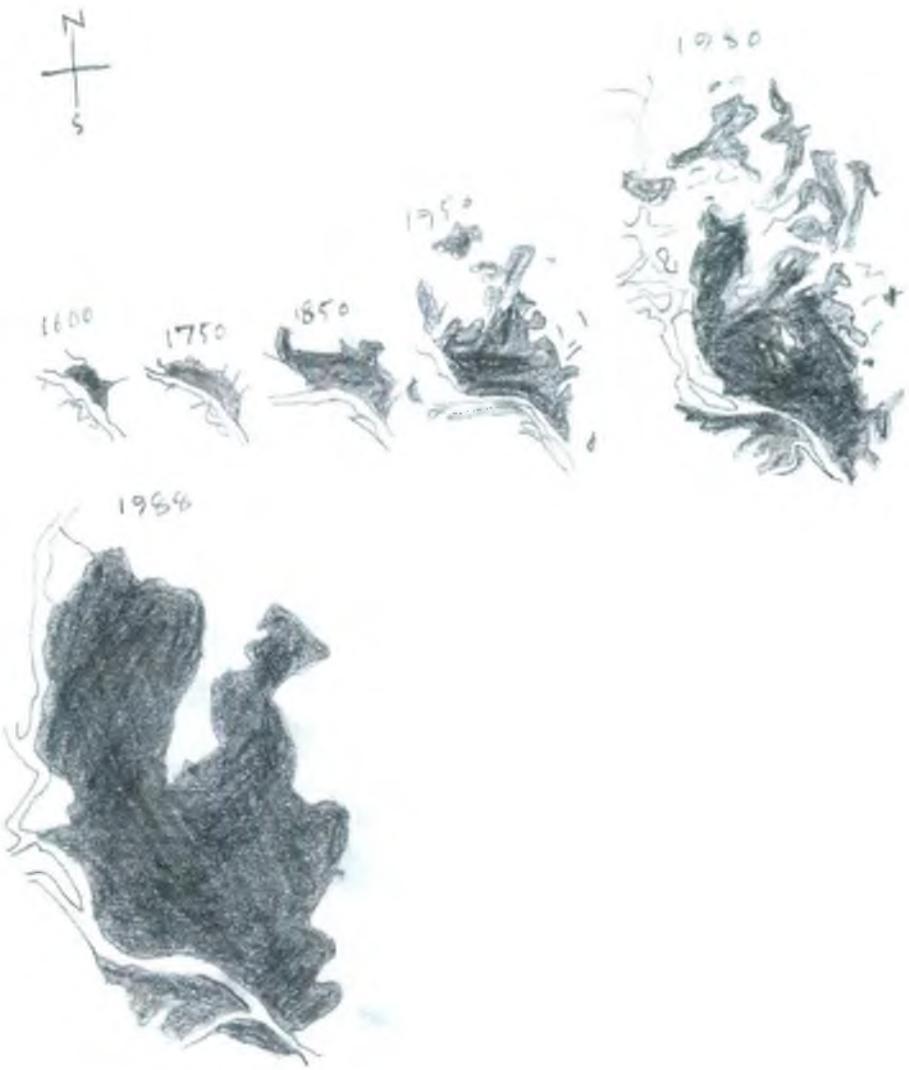

THE GROWTH OF DHAKA CITY (1600-1988)

Dhaka University Institutional Repository

MAP OF DHAKA CITY

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

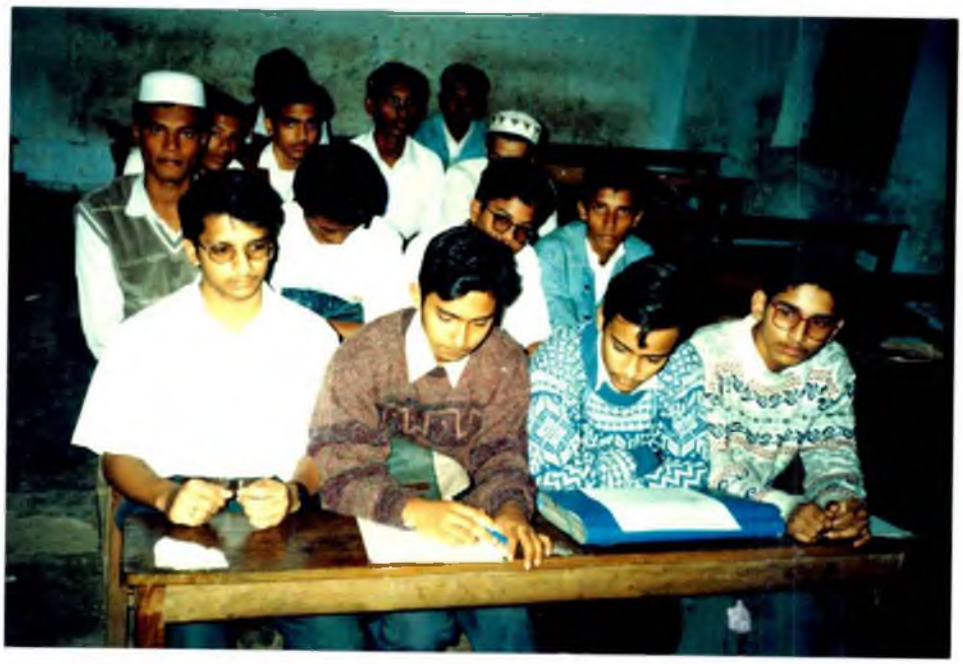

ছবিতে মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের ছাত্ররা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে সেগুন বাগিছা হাইস্কুলের ছাত্ররা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল

ছবিতে মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে সেগুন বাগিচা হাইস্কুল।

ছবিতে বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালর।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাই, সেগুন বাগিচা হাইস্কুল।

ছবিতে প্রধান শিক্ষিকা বেগম রাজিয়া হোসাইন বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে নটরডেম কলেজের ছাত্ররা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়।

ছবিতে হাবিবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে হাবিবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্ররা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে সিদ্বেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ।

ছবিতে অধ্যক্ষ ফাদার জে. এস. পিশাতো, সি. এস.সি., নটরডেম কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে অধ্যক্ষ মোঃ তাহাজ্জাদ হোসেন, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ।

ছবিতে ঢাকা কলেজের ছাত্রয়া প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে সেন্ট্রাল উইমেন কলেজের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে বেগম বদরুননেসা মহিলা কলেজ।

ছবিতে সেন্ট্রাল উইমেন কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে শেখ বোরহান উদ্দীন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নমালা পূরণ করছে।

ছবিতে ঢাকা কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র

ছবিতে অধ্যক্ষা আমেতুল খালেক বেগম, সেন্ট্রাল উইমেন কলেজ।

ছবিতে অধ্যক্ষা ক্যাপ্টেন রওশন আক্তার হানিফ, বেগম বদরুননেসা মহিলা কলেজ।